বুদ্ধদেব বসু

রাত ভ'রে বৃষ্টি

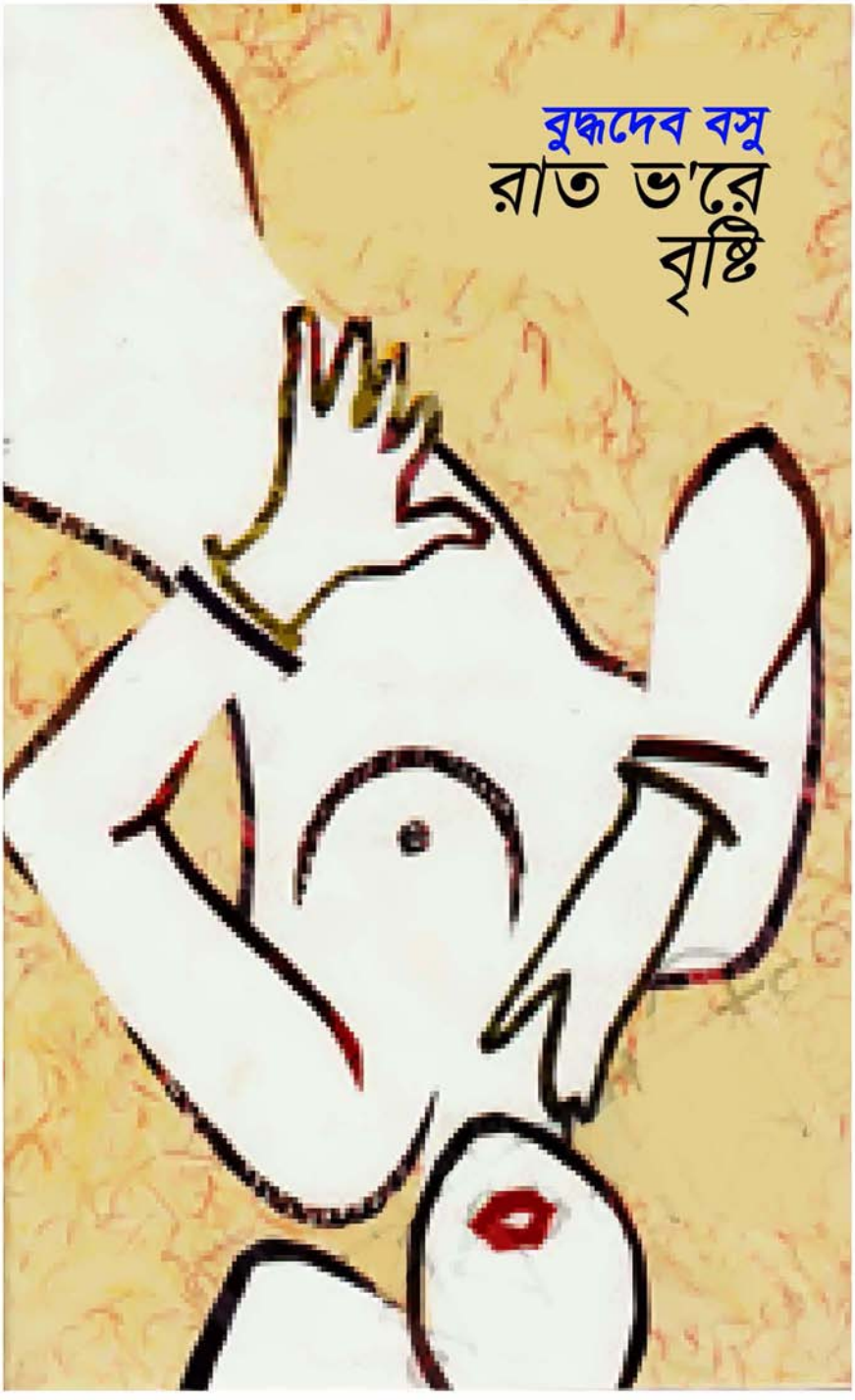

রাত ভ'রে বৃষ্টি

বুদ্ধদেব বসু

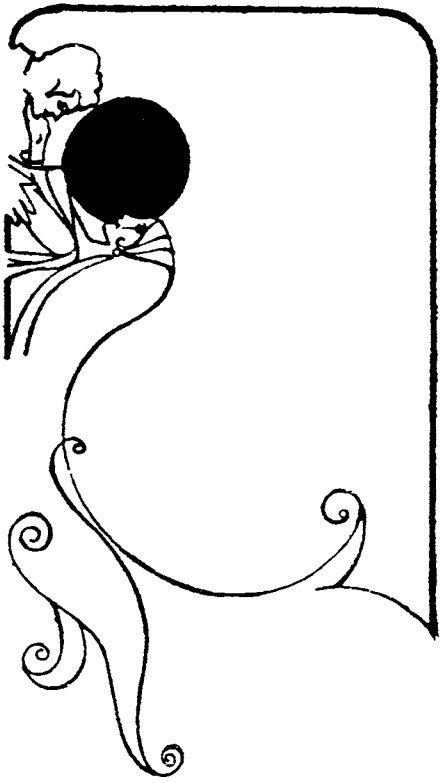

আজকাল প্রকাশনী ।। ঢাকা

বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' বইটি ছাপাবার জন্য বাংলাদেশের প্রকাশক 'আজকাল' প্রকাশনকে আমি অনুমতি দিচ্ছি।

প্রতিভা বসু ২৮.১০.৯৩

রাত ভ'রে বৃষ্টি ❐ বুদ্ধদেব বসু

প্রথম আজকাল প্রকাশনী সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৪ প্রকাশক: নিখিল চন্দ্র পাল। আজকাল প্রকাশনী ৪৭ পাতলা খান লেন ঢাকা ১১০০। প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ। বর্ণবিন্যাস: কমপ্রিন্ট কম্পিউটার্স ৫৯ প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০। মুদ্রণ বসুন্ধরা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ১৫ র‍্যাংকিন স্ট্রীট ওয়ারি ঢাকা।

দাম : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র।

এক

হ'য়ে গেছে—ওটা হ'য়ে গেছে—এখন আর কিছু বলার নেই। আমি, মালতী মুখোপাধ্যায়, একজনের স্ত্রী আর একজনের মা, আমি ওটা করেছি। করেছি জয়ন্তর সঙ্গে, জয়ন্ত আমাকে চেয়েছে, আমিও তাকে। নয়নাংশু হয়ত ভাবছে আগেই করেছিলুম, কিন্তু না—আজই প্রথম। আজ রাত্রে—চার ঘন্টা আগে। এই বিছানায়। যেখানে মালতী এখন শুয়ে আছে।

কেমন ক'রে হ'লো? খুব সহজ। সত্যি বলতে আগে কেন হয় নি জানি না—আমার সংযমে, জয়ন্তর ধৈর্যে, আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি। রাত্তির ন'টা নাগাদ জয়ন্ত এলো, আর তক্ষুনি এমন বৃষ্টি নামলো যে আধ ঘন্টার মধ্যে জল দাঁড়িয়ে গেলো আমাদের গলিতে। দশটা, সাড়ে দশটা—বৃষ্টি আর থামে না। অংশু গেছে তার মুমূর্ষু পিসিমাকে দেখতে বেলেঘাটায়, বুন্নি আমার মা-র কাছে থাকছে আজ, দুর্গামণি ভাঁড়ার ঘরে মাদুর বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি ফ্ল্যাটের দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে শোবার ঘরে এলুম—বৃষ্টির ছাঁটে কিছু ভিজেটিজে যাচ্ছে কি না দেখার জন্য। 'আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেলো, নয়নাংশুর দেরাজে আছে নাকি দু-এক প্যাকেট?' বলতে বলতে জয়ন্তও এলো শোবার ঘরে। আমি নিচু হ'য়ে যখন দেরাজ ঘাঁটছি তখন জয়ন্ত পিছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরলো, আমি মুখ তুলে তাকিয়ে বললুম, 'তাহ'লে সিগারেট চাও না?' সে আমার কানের উপর ঠোঁট চেপে ডাকলো, 'লোটন!' আমি তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে আলো নিবিয়ে দিলুম। এমনি ক'রে হয়ে গেলো ব্যাপারটা।

ভালো লাগছে, এখন বেশ ভালো লাগছে আমার। বুঝতে পারছি এতদিন এটা ঠেকিয়ে রেখে ভালো করি নি।

গা-ভরা আরাম নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ চোখ খুলে দেখি আলো জ্বলছে আর চুপচুপে ভেজা জামা-কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে নয়নাংশু। আমি বললুম, এই এলে?' 'হ্যাঁ—আমার পাজামাগুলো কোথায় আছে জানো নাকি?' 'ঐ যে বাঁ দিকের দেরাজে', ব'লে আমি আবার একটু চোখ বুজলুম, অলস লাগছিলো, উঠতে ইচ্ছে করছিলো না। অংশু বললে, 'এত রাতে ফ্ল্যাটের দরজা খোলা রেখে ভালো করো নি, তুমি আর দুর্গামণি ছাড়া কেউ বাড়ি নেই, দু-জনেই অঘোরে ঘুমুচ্ছো—যাকে বলে চোরকে ডেকে আনা, এ হলো তাই-ই। 'খোলা ছিলো নাকি দরজা?' নয়নাংশু কাপড় ছাড়তে বাথরুমে ঢুকলো, আমি হঠাৎ তাকিয়ে দেখলুম ওর খাটের উপর আমার ব্লাউজটা পড়ে আছে, আমি শুয়ে আছি কোনোমতে শুধু শাড়িটা জড়িয়ে—তড়াক ক'রে উঠে ব্লাউজ প'রে নিলুম, শাড়িটা ঠিকমতো ঘুরিয়ে দিয়ে, চুল আঁচড়ে, মুখে একটু পাউডারও বুলিয়ে নিলুম তাড়াতাড়ি—আয়নায় মনে হ'লো না মালতীকে অন্য দিনের চাইতে কিছু আলাদা দেখাচ্ছে। কিন্তু কী রকম ভুল হয়, আশ্চর্য—তখন আমি ভালবাসতে গিয়েও দরজা বন্ধ করতে ভুলি নি (প্রেম তাহ'লে বেপরোয়া উদ্দাম নয়?), কিন্তু জয়ন্ত চ'লে যাবার পর হাট হ'য়ে রইলো ফ্লাটের দরজা, ঘরের দরজা, জামাটা পর্যন্ত গায়ে দিতে মনে থাকলো না, তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়লুম। নয়নাংশু কিছু লক্ষ্য করেছে নাকি? তা করুক গে—একজন বিবাহিতা মহিলা তাঁর শোবার ঘরে যে-ভাবেই শুয়ে থাকুক, তা নিয়ে কার কী বলবার আছে?

খেতে ব'সে অংশু জিগেস করলে, 'এত রাত অবধি না-খেয়ে ছিলে কেন?' 'রাত অনেক বুঝি?' 'বারোটা। খেয়ে নিলেই পারতে।' বারোটা শুনে অবাক লাগলো আমার, জয়ন্ত আসার পর থেকে ঘন্টাগুলি ছিলো কি ছিলো না তখন যেন মনে করতে পারছিলুম না, যদি বুঝতুম এত রাত হয়েছে তা' হলে আমার নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা হ'তো অংশুর জন্য, আর সে ঘরে ঢোকামাত্র বলতুম, 'কী কাণ্ড! এত রাত করলে! এদিকে আমি ভেবে-ভেবে সারা!' অংশুর দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো সে এখনো ঐ রকম কিছু শুনতে চাচ্ছে আমার মুখে; তাই বললুম, 'তোমার এত দেরি হ'লো কেন?' 'বাঃ, কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ! কী তুমুল বৃষ্টি আজ কলকাতায়—বেলেঘাটা গঙ্গা হয়ে গেছে, হেঁটে-হেঁটে শেয়ালদার মোড়ে এলুম, তারপর রিকসাতে জোড়াগির্জে অবধি এসে তবে একটা ট্যাক্সি জুটলো।' বেশ তৃপ্তির সঙ্গে কথাগুলো বললে নয়নাংশু, যেন সুন্দরবনে বাঘ মেরে এসেছে—আমার মনে পড়লো কয়েকদিন আগে বাথরুমে একটা বিছে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলো সে, তারপর কোত্থেকে একটা লাঠি যোগাড় ক'রে খুব সাবধানে দূর থেকে মেরেছিলো ঐ একরত্তি প্রাণীটাকে। আমার কাছে এসে বলেওছিলো, 'ওটাকে মেরেছি।' আমি ওর দিকে না তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলুম, 'খুব বীরত্ব করেছো!' (যেন চার বছর আগেকার বুন্নি বলছে, 'মা, মা, শোনো—জানালায় একটা কাক বসেছিলো, আমি তাড়িয়ে দিয়েছি!') ওকে মাঝে মাঝেই বালকের মতো লাগে আমার, বাচ্চা ছেলের মত—আর, একজন পূর্ণ যুবতীর বালক স্বামী হ'লে কেমন লাগে? জয়ন্ত হ'লে কী করতো ওখানে? কথাটি বলতো না-নিঃশব্দে পিষে দিতো স্যান্ডেলের তলায়।

মুর্গির ঝোল দিয়ে ভাত মেখে নিয়ে নয়নাংশু বললে, 'তোমাকে অনেকদিন বলেছি—আমার জন্যে ব'সে থেকো না, সময়মতো খেয়ে নিয়ো।' আমি জবাব দিলুম, 'একা-একা খেতে বিশ্রী লাগে আমার'। কথাটা কিন্তু খাঁটি—একটুও বানানো নয়—নয়নাংশুর ফিরতে যত দেরিই হোক ওকে ফেলে খেতে পারি না আমি, ওটা আমার অভ্যাস—হয়তো একেই সংস্কার বলে—ছেলেবেলায় মা-কে দেখতুম বাবার জন্যে ব'সে থাকতে, হয়তো তা'ই থেকে এসেছে। অংশু মুহূর্তের জন্য খাওয়া থামিয়ে জিগেস করলে, 'কেউ এসেছিলো?' আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলুম 'জয়ন্ত—জয়ন্তবাবু এসেছিলেন ন-টা নাগাদ। তোমার জন্য অনেকক্ষণ ব'সে ছিলেন।' (এই এক ঝামেলা—অন্যদের সামনে 'বাবু' বলা, 'আপনি' বলা!) 'আমার জন্য কেন?' 'কী যেন দরকার ছিলো ওঁর পত্রিকার ব্যাপারে।' 'তা ওকে বসিয়ে রাখলে না?' বলে নয়নাংশু আমার চোখে চোখ ফেললো। আমি চোখ নামিয়ে নিলুম না, বরং বেশ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বললুম, 'বেশ কথা! বারোটা অবধি বসিয়ে রাখা যায় নাকি কাউকে! আর আমি বললেই বা উনি থাকবেন কেন—নিজের বৌ ছেলেপুলে নেই!' এর পর নয়নাংশু বললে, 'কী করে গেলেন এই বৃষ্টির মধ্যে?' এর উত্তরে আমি অনায়াসে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলতে পারতুম, 'কী ক'রে গেলেন তার আমি কী জানি!' কিন্তু আমি তা করলুম না, মুখে হাসি টেনে বললুম, 'জানো তো জয়ন্তবাবু কী রকম মানুষ—ও-সব বৃষ্টি ফৃষ্টিকে উনি পরোয়া করেন না।' আমার হাসির উত্তরে আরো একটু স্পষ্ট ক'রে হেসে বললো, 'ঠিক বলেছো। মনে আছে বুন্নির জন্মদিনে—কালবোশেখির ঝড়ে এমন হ'লো যে ট্রাম—বাস সব বন্ধ রসা রোড জলে থৈ-থৈ, জয়ন্তবাবু তারই মধ্যে হেঁটে হেঁটে চ'লে এলেন টালিগঞ্জ থেকে। সত্যি আশ্চর্য!' আমি কোনো জবাব দিলুম না ও-কথার, কেননা সেই সন্ধ্যাটা আমি ভুলি নি নয়নাংশু তা ভালোই জানে—এমন দু-একটা ঘটনা ঘটে যা ভোলা যায় না; আমি সেদিন বুঝেছিলুম যে জল ভেঙে তিন মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে বুন্নির জন্য আসে নি জয়ন্ত, নয়নাংশুর জন্যও আসে নি—আমার জন্য, আমারই জন্য এসেছে। আর তা অংশুও বুঝে নিয়েছিলো—বোকা তো নয়, প্রথম থেকে বুঝে নিয়েছিলো কী হচ্ছে বা হ'তে যাচ্ছে, আর ঐ একটা বিষয়ে টনটনে জ্ঞান নেই এমন কোন স্বামী আছে পৃথিবীতে?

খাওয়ার পরে নয়নাংশু যখন সিগারেট ধরিয়েছে আমি জিগেস করলুম, 'ও' হ্যাঁ—তোমার পিসিমাকে কেমন দেখলে? 'হ'য়ে এসেছে—আর দু-চারদিনের ব্যাপার হয়তো।' 'অজ্ঞান হ'য়ে আছেন?' না কিন্তু—বেশ জ্ঞান আছে, দুটো-একটা কথাও বলেন মাঝে মাঝে, সলতে-ভেজানো

গঙ্গাজল চুষে নেন আর টুলটুলে চোখে তাকিয়ে থাকেন লোকের দিকে।' 'তোমাকে চিনতে পারলেন?' 'তা কেন পারবেন না?' আমি হঠাৎ বললুম, 'আমাকে নিয়ে গেলে না কেন?' 'আমি তো বললুম তোমাকে—তুমি যেতে চাইলে না।' 'তুমি জোর করলে না কেন? আমি তো বুঝি নি এ-রকম এখন-তখন ব্যাপার।' নয়নাংশু আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে জবাব দিলে, 'ইচ্ছে করলে কালও যেতে পারে।—এক্ষুণি কিছু হ'য়ে যাচ্ছে না। কোনো অসুখ তো নয়—নেহাত বুড়ো হয়েছেন ব'লেই—যেমন একটা গাছ ম'রে যায়, তেমনি।' এর পরে আর কথা বললুম না আমরা, যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লুম!

পাশাপাশি দুটো খাট, ছোটো ঘর, হাত বাড়ালে হাত ছোঁয়া যায় এতটাই কাছাকাছি, যদি নয়নাংশু ঘুমিয়ে পড়ে আর আমি জেগে থাকি তাহ'লে ওর নিশ্বাস আমি শুনতে পাবো। কাল অন্যরকম ক'রে সাজাবো ঘরটাকে, দুটো খাট অত কাছাকাছি থাকা স্বাস্থ্যকর নয়—জেগে জেগে আর-একজনের ঘুমন্ত ভারি নিশ্বাস শুনতে কার ভালো লাগে? বা বুন্নির ঘরে আমার খাট পেতে নেবো—ওটা আরো ছোটো কিন্তু দক্ষিণ খোলা, সারাক্ষণ পাখার হাওয়া ভালো লাগে না আমার, মাথার মধ্যে যেন জাম্ ধ'রে থাকে সকালে। এ-ঘরটা গুমোট, এই তো একটু বৃষ্টি থেমেছে আর গরম, বনবন পাখার শব্দ পোকার মতো মাথার মধ্যে—আমরা দু-জনেই জেগে আছি, দু-জনেই জানি অন্য জন ঘুমোয় নি; একই ঘরে, অন্ধকারে, দুই অনিদ্রা মাকড়সার মতো জাল বুনে যাচ্ছে। মস্ত মোটা দুটো মাকড়সা, মাথার উপর জ্বলজ্বলে চোখ—একটা জাল অন্যটাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে অন্যটার মধ্যে—ঘর ছেয়ে গেলো। এখন আর বৃষ্টি নেই, কিন্তু আমি এখনো বৃষ্টির শব্দ শুনছি, একটা আবছা নীল-সুড়ঙ্গের উপর বৃষ্টি, ছাদ ফেটে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে জল পড়ছে—বড্ড গরম—আমার চোখের তলার অন্ধকার ছিঁড়ে হলদে লাল ফুটকি বেরিয়ে এলো, সুড়ঙ্গটা কোথায় শেষ হয়েছে কেউ জানে না, আমার দম আটকে আসছে। তোমরা ভাবছো আমি ভয় পেয়েছিলাম? তা'হলে তোমরা মালতীকে চেনো না।

আজকাল—অনেকদিন ধ'রে—মালতী এড়িয়ে চলে তার স্বামীকে। স্বামী তাকে চায়—কেনই বা চাইবে না?—কিন্তু নয়নাংশুর ঐ বেঁটে আঙুলগুলো ওর ভালো লাগে না, তার নিশ্বাসের গন্ধ ওর ভালো লাগে না, সে ওর গা ঘেঁষে শুয়েছে ভাবতে ও শিউরে ওঠে, সে ওর গায়ে হাত রাখলে ও কাঠ হ'য়ে যায়। কী করতে পারে মালতী, যেমন আমরা গায়ে পিন ফুটলে 'উ' বলি এও তেমনি। ও স্বামীকে বোঝায় যে ও-সব আর ভালো লাগে না ওর, পুরো ব্যাপারটাতেই অরুচি ধ'রে গেছে, বয়স হলো, মেয়ে বড়ো হচ্ছে, ইত্যাদি সব টালবাহানা শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে দেয়। কিন্তু মালতীর বয়স বত্রিশ মাত্র, নয়নাংশুর সাঁইত্রিশ, আর ওদের মেয়ে সবে আটে পড়লো—কেমন কাতর হ'য়ে যায় নয়নাংশুর মুখ যখন গুটিশুটি পায়ে ফিরে যেতে হয় নিজের বিছানায়, আর তখন মালতীর আরো বিশ্রী লাগে তাকে, পুরষ মানুষের ঐ কাতর চেহারা ওর দু'চক্ষের বিষ। আসল কথা, জোর নেই, ভারি ভদ্রলোক, সে যাকে বুর্জোয়া বলে ঠাট্টা করে তা'ই, জয়ন্ত যাকে বুর্জোয়া ব'লে ঘেন্না করে তা-ই। যখন কাপড় চোপড় প'রে থাকে, স্যুট প'রে আপিশে বেরোয়, পাজামা-পাঞ্জাবি প'রে ব'সে থাকে বাড়িতে, তখন আমার বেশ লাগে ওকে—কথাবার্তায় চৌকশ, অনেক বই পড়েছে, সুশ্রী, লোকেদের সঙ্গে ব্যবহার নিখুঁত। মেয়েরা এখনো প্রেমে পড়তে পারে ওর সঙ্গে (ওর আপিশের অপর্ণা তো মুগ্ধ), আমিও একটা বয়সে পড়েছিলুম। বিয়ের সময় ভেবেছিলুম খুব জিতেছি, কিন্তু তার পর দশ বছর... বারো বছর কাটলো, যৌবনের প্রথম ঝাপ্‌টা কেটে যাবার পরেই ও যেন বালকের মতো হ'য়ে যেতে লাগলো দিনে দিনে—অন্তত আমার তা-ই মনে হ'লো—স্বামী হিসেবে, প্রেমিক হিসেবে ওকে যেন আর ভাবতে পারছি না আমি—আমার শরীর যেন আমাকে ফেলে আলাদা হ'য়ে রেগে উঠলো নয়নাংশুর উপর, আমি রোগা হ'য়ে গেলুম, অসুখে পড়লুম একবার, সেই অসুখটাও যেন নয়নাংশুকে দূরে রাখার একটা উপায়। আগে ছিলো একটা গুমরানো ধোঁয়ানো গোছের রাগ, কেন রেগে আছে জানে না? কিন্তু জয়ন্তর সঙ্গে দেখা হবার পর আমি হঠাৎ কারণটা বুঝে ফেললাম।

আমার বিয়ের পর পিসিমা বলেছিলেন, 'সোয়ামীর মতো ধন আর নেই, বুঝলি?' নয়নাংশুর পিসিমার কথা বলছি। ওঁর মুখে ও-কথা শুনে আমার একটু হাসি পেয়েছিলো, কেননা শুনেছিলুম উনি তের বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন (বিয়ে হয়েছিলো বারোতে)—'স্বামী' ব্যাপারটা গোল না চৌকো না তেকোণা তাও উনি ঠাহর করবার সময় পান নি—একটা ফাঁকা আওয়াজ, একটা ফ্যাকাসে, ময়লা, মর্চে-পড়া, রং-চটা, ঝুলকালি-মাখা ধাবণা—ওঁর কাছে 'স্বামী' কথাটা হ'লো, তা-ই, অথচ তারই কী সাংঘাতিক প্রতাপ! বিয়ের প্রথম বছরটা বেলেঘাটাতেই ছিলুম আমরা—নয়নাংশুর পৈতৃক বাড়ি সেটা—শ্বশুর-বাড়িতে ঐ বুড়ি পিসিমা আমাকে বিশেষ একটু ভালোবেসেছিলেন, আদর ক'রে 'তুই' বলতেন, হঠাৎ-হঠাৎ নয়নাংশুর ঢাক পিটিয়ে যেতেন কখনো আমাকে একা পেলে—'জানিস, পরীক্ষায় মেডেল পেয়েছিলো!'—'ওর সঙ্গে সাহেবদেরও আলাপ আছে, জানিস!'—আমি তখন সবেমাত্র রক্তের স্বাদ পেয়েছি, ওঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতুম এই চিরবিধবা চিরকুমারী চিরদুঃখী মহিলাটিকে দুঃখী কেন মনে হয় না, তিনি কি কখনো নিজের জীবনের কথা ভাবেন না, কী ব্যর্থ কী শূন্য কী নিস্ফল—কিন্তু সত্যি বলতে তাঁর মতো শান্ত হাসিখুশি মেজাজের মানুষ আমি কমই দেখেছি; একবেলা খেয়ে মাসে দুটো একাদশী করে শিবরাত্রি অম্বুবাচীর লম্বা উপোসে টাটিয়ে থাকে—দিব্যি তো কাটিয়ে দিলেন এতগুলো বছর আর কী কাজের, কখনো দুপুরে ঘুমোন না, ডালের বড়ি দেন, আমসত্ত্ব আচার তৈরি করেন, বুড়ো চোখ নিয়েও কাঁথা সেলাই করেন চমৎকার, নিরিমিষ রান্নার হাত তাঁর চমৎকার—তাঁকে কখনো দেখি নি খালি হাতে ব'সে থাকতে-কোনো নালিশ নেই, নালিশের কোনো কারণ তাঁর থাকতে পারে তা জানেন না বলেই নালিশ নেই—অদ্ভুত! কিন্তু যদি কেউ এসে তাঁর কানে জপাতো, 'শুনুন বামাসুন্দর, আপনি দুঃখী, আপনি বঞ্চিত, আপনার বিদ্রোহ করা উচিত'—তা' হলেই হয়তো অন্য রকম হ'তো তাঁর জীবন। কিন্তু জানি না হঠাৎ পিসিমার কথা এত ভাবছি কেন ও, হ্যাঁ, তাঁর অসুখ, আর দু-চারদিনের ব্যাপার, আমি কাল তাঁকে দেখতে যাবো, আজ যাই নি পাছে জয়ন্ত এসে ফিরে যায়, কিন্তু কাল নিশ্চয়ই।

আমি 'বৌ' হ'তে পেরে খুব খুশী হয়েছিলুম, বিয়ের পরে প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছিলুম রীতিমতো 'ভাল বৌ' হতে, বেলেঘাটার বাড়ির সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে চেয়েছিলুম, কিন্তু নয়নাংশু আমার সেই চেষ্টা বানচাল ক'রে দিলে। আমকে বলে, 'মা যখন রান্নাঘরে যান তুমিও সঙ্গে সঙ্গে যাও কেন?' 'বাঃ যাবো না!' 'ওটা উত্তর হ'লো না—কেন যাও বলো, সত্যি তো ওখানে তোমার করার নেই কিছু।' আমি মনে-মনে খুশী হলুম, এ-কথা ভেবে যে অংশু সব সময় আমাকে কাছে পেতে চায়, একটু দুষ্টুমি ক'রে বললুম, 'আমার ইচ্ছে তাই যাই—হ'লো?' উঁহু, ঠিক বললে না, ভালো দেখাবে তাই যাও, বৌদি যান তাই যাও, ও-সব হ'লো তোয়াজ, মন যোগানো।' 'না-হয় তা-ই হ'লো—দোষ কী?' 'দোষ এই যে ওটা অনেষ্ট নয়, আসলে যা ভালো লাগে না তা-ই করছো যেহেতু অন্যেরা তাতে খুশী হবে, আবার ভাবটা এমন দেখাচ্ছো যে সেটাই ভালো লাগছে তোমার।' আমি হেসে বললুম, 'অনেক ছেলে স্কুলে যেতে ভালোবাসে না, তাদের কি তবে না-যাওয়াই উচিত?' 'সেটা আর এটা এক কথা নয়, স্কুলে না-গেলে ছেলেটার নিজেরই ক্ষতি, কিন্তু শাশুড়িকে তোয়াজ করে তোমার আত্মার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। তাছাড়া, বাচ্চাদের শাসনে রাখতে হয়, কিন্তু তুমি ত সাবালক।' ওর এ-সব কথা আমি প্রথম-প্রথম ঠিক বুঝতে পারতাম না; খানিকটা চমক লাগতো যখন ও নিজের খুড়তুতো ভাইকে বলতো, 'Lout' (যেহেতু সে কথায়-কথায় আজেবাজে রসিকতা করে আর ধড়াশ ক'রে শুয়ে পড়ে যে-কোন সময়ে যে-কোন বিছানায়)—ভাবতুম এ আবার কী-রকমের কথা, হাজার হোক ভাই তো, আবার মনে-মনে অংশুকে তারিফ না ক'রে পারতুম না ওর মতামত অমন স্পষ্ট আর নতুন ধরনের ব'লে। আমার মন থেকে ছাত্রীর ভাবটা একেবারে কেটে যায়নি তখনও—আমি দেখতুম ও শুয়ে-শুয়ে যে-সব বই পড়ে আমি তাতে দাঁত বসাতে পারি না, আমার চেয়ে বুদ্ধিও ওর বেশি ব'লে ধ'রে নিয়েছিলুম—তবু মনের তলা থেকে অন্য একটা ভাবও ঠেলে ওঠে মাঝে-মাঝে, আমি দেখতে পাই

কোনো-কোনো বিষয় একেবারেই বোঝে না নয়নাংশু, বোঝে না আমার মন আমার নারীত্বকে; কেন আমি জায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে যেতে ভালবাসি, কেন ওর মা-র কাছে রান্না শিখি মাঝে-মাঝে, আর শ্বশুরবাড়ির সকলের সঙ্গে যে মিলে-মিশে বন্ধুভাবে থাকতে চাই তা অন্য কোনো সাংসারিক কারণে নয়, সত্যি আমার ভালো লাগে ব'লেই—এই সহজ কথাগুলো কিছুতেই বোঝে না নয়নাংশু, বোঝার চেষ্টাও করে না। এই যে বিয়ে হ'লো—এ থেকে সে চায় পুরোপুরি আস্ত তার স্ত্রীটিকে শুধু, আর আমি চাই—শুধু স্বামীকে নয়, স্বামীকে কেন্দ্র ক'রেএক নতুন জীবন, চাই নিজেকে ছড়িয়ে দিতে ওদের বেলাঘাটার বাড়ি সব-কিছুর মধ্যে, অংশিদার হ'তে, এমনকি অধিকারিণী হ'তে। কিন্তু অংশু আমাকে আস্তে-আস্তে কিছুটা ওর ধরনে ভাবতে শেখালে; বোঝালে, যে বেলেঘাটার জনবহুল মস্ত তেতল বাড়িতে অসুবিধে হচ্ছে আমাদের; যে যৌথ পরিবারের মতো কুৎসিত ব্যাপার আর নেই, ওতে মানুষগুলো পরস্পরের মধ্যে লেপটে পিণ্ড পাকিয়ে যায়, কেউ আলাদাভাবে, সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। কিছুদিনের মধ্যে আমিও ওর মতো স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, কবে আমরা আলাদা বাড়িতে উঠে গিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো স্বাধীনভাবে থাকতে পারবো। 'প্রত্যেক সাবালক মানুষই আলাদা, আলাদা এক-একজন ব্যক্তি, তোমার ভিতরকার সেই ব্যক্তিত্বকে তুমি ফুটিয়ে তুলবে—অন্যদের ছাঁচে গড়া হবে না।'—এই ধরনের কথা বার-বার আমি শুনেছি নয়নাংশুর মুখে, যখনই ননদ-জায়েদের সঙ্গে দল বেঁধে বেরিয়েছি শাড়ি-জামা কিনতে বা কোনো হিন্দি ফিল্ম দেখতে, বা গান গেয়েছি শাশুড়ির বেস্পতিবারের লক্ষ্মীপুজোয়, বা ক্যারাম খেলেছি আমার সেই বোকাসোকা ভালোমানুষ দেওরের সঙ্গে। আর একটা কথা প্রায়ই বলে নয়নাংশু-'শাড়ি-গয়না-হিন্দি সিনেমা—ও সব মেয়েলিপনা ছাড়ো তো!' আমি জবাব দিই, 'বাঃ আমি তো মেয়েই—মেয়েলি হবো না তো কী হবো!' 'মেয়ে হওয়া আর মেয়েলি হওয়া এক কথা নয়।' সূক্ষ্ম তফাতটা কোথায় তা বুঝিয়ে দেবেন, স্যার!' আমার ঠাট্টার উত্তরে আমাকে জাপটে ধরলো অংশু; তখনকার মতো তর্ক ফুরালো, কিন্তু আবার কোনো উপলক্ষ ঘটলে ও আমাকে একই কথা শোনায়—যার সারাংশ হ'লো এই-এই জিনিস, এই-এই কাজ ওর 'ভালো লাগে না।' অর্থাৎ—অন্যেরা আমাকে যে ভাবে চায় সে-রকম আমাকে হ'তে দেবে না নয়নাংশু, কিন্তু নিজের মনোমতো ক'রে ঢেলে সেজে নেবে; আমি অন্যের ছাঁচে গড়া হবো না, অর্থাৎ শুধু নয়নাংশুর ছাঁচে গড়ে উঠবো, ও যাকে আমার 'ব্যক্তিত্ব' বলে সেটা হ'লো আসলে তা-ই। এই কথাটা তখন আমি ভাবিনি অবশ্য, অনেক পরে সেই দিনগুলির কথা ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছিলো, কিংবা হয়তো এইমাত্রই ভাবলুম। তখন আমার পক্ষে এমন কিছু ভাবা সম্ভব ছিলো না যা অংশুর পক্ষে, আর আমার পক্ষেও, গৌরবের নয়—ও যে আমাকে পুরোপুরি দখল ক'রে নিতে চেয়েছিলো সেটাতেও ওর অসামান্য ভালোবাসারই প্রমাণ আমি পেয়েছিলুম—তখন পর্যন্ত ও আমাকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলো।

মুগ্ধ, তবু—যেহেতু আমার স্বাভাবিক বুদ্ধিসুদ্ধি খানিকটা আছে, তাই সেই তখনই, যখন পর্যন্ত আমার গা থেকে নতুন বিয়ের গন্ধ কাটেনি, তখনই আমার মনে হয়েছিলো অংশু যেন বড্ড বেশি বই-পড়া মানুষ, যা-কিছু বইয়ে প'ড়ে তার ভাল লেগেছে তাই যেন তার জীবনেও খাটাতে চায়। কলেজে শেষ কয়েকমাস ওর ছাত্রী ছিলুম আমি—প্রথম দেখা সেখানেই—টাটকা-পাশকরা ছোকরা মাস্টার, চেহারা ভালো, কথাবার্তায় ঝকঝকে, আমাদের ক্লাসের উনতিরিশটি মেয়ের মধ্যে এমন কেউ ছিলো না যার বুকের মধ্যে মলয়সমীরণ ঝিরঝির ক'রে ব'য়ে যায়নি। আমি একদিন অন্যদের সঙ্গে বাজি রেখে আলাপ ক'রে এলুম পড়াশুনোরই কিছু একটা ছুতো ক'রে—তারপর দেখি হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে কয়েকটা বই হাতে নিয়ে, ওগুলো নাকি পরীক্ষার পক্ষে বিশেষ জরুরী। আমি মনে মনে বললুম, 'ও, তাহলে তোমারও মনে এই কথা!' দিন দশেক পরে বই ফেরত নিতে এলো, আমি তখনও পড়িনি শুনে কয়েকটা বাছা বাছা অংশ নিজে প'ড়ে শোনালে আমাকে, ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলো—আমি খুব মন দিয়ে শুনলুম

কিন্তু কিছুই শুনলুম না, শুনলুম ওর গলার আওয়াজ আর দেখলুম ওর মুখের ভাব, ঠোঁটের নড়াচড়া, আর তারপর যখন আমরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় পৌঁছে যাচ্ছি আর আমার বাড়ির সবাই বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা আর তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হচ্ছে (কুমারী মেয়ের সঙ্গে কোনো যুবকের ঘনিষ্ঠতা দেখলে মা-বাবা এখনো উদ্বিগ্ন না-হ'য়ে পারেন না, অথচ একবার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল সারা জীবনের মতো কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে যান, যেন বিয়ে একটা সর্বজ্বরহর অব্যর্থ মাদুলি!) —তখনও অংশু আমাকে যত কথা বলে তার মধ্যে বইয়ের কথা ঘুরে—ফিরে চ'লেই আসে। বিয়ের পরেও তেমনি; রাত্রে ঘরে এসে, কি রোববার দুপুরে খাওয়ার পরে, সে আমাকে ইংরাজি কবিতা প'ড়ে শোনায়—প্রেমের কবিতা—ডি.এইচ. লরেন্সকে নিয়ে সে খুব মেতেছে তখন— কিন্তু তখন তো আর কোর্টশিপের অবস্থা নেই যে যে কোনোভাবে তাকে কাছাকাছি পেলেই খুশী হবো আমি, খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্য রকম ব্যবহার আশা করছি তার কাছে, অন্য কিছুতে মন দিতে পারছি না, আমার অবাক লাগছে যে-মানুষ হাতে-কলমে প্রেম করতে পারে সে প্রেমের কবিতা পড়বে বা শোনাবে কেন, বা কথা বলবে কেন তা নিয়ে—আর অবশেষে সে যখন আমাকে কাছে টানে সেটাও এমন নরম হাতে আর সন্তর্পণে যে আমার এক-এক সময় মনে হয় এই প্রেম করাটাকেও সে যেন মনে মনে কোনো বই থেকে তর্জমা করে নিচ্ছে-অবশ্য মুখে আমি প্রায়ই বলি, 'উঃ কী অসভ্য! বর্বর! এই বুঝি দস্যিপনা শুরু হ'লো আবার।' ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা যা যুগে যুগে মেয়েরা ব'লে এসেছে পুরুষটিকে আরো বেশি তাতিয়ে তোলার জন্য—কিন্তু ওর 'দস্যিপনা'র চরম মুহূর্তেও হঠাৎ খুব আবছাভাবে আমার মনে হয় যে অংশু ঠিক আমাকে ভালোবাসছে না, ও যে আমাকে ভালোবাসে সেই ধারণাটাকে ভালোবাসছে। অথচ এই 'ভালোবাসা' নিয়ে কতই না লম্বা-চওড়া বক্তৃতা ওর।

আমাদের বিয়ের পাঁচ মাস পরে একটা ঘটনা ঘটলো যা নিয়ে সে সময়ে বেশ সোরগোল হয়েছিলো কলকাতায়। একজন নামজাদা ব্যারিস্টার, বয়স পঞ্চান্ন, হঠাৎ একটি এম. এ. ক্লাশের বিবাহিতা ছাত্রীকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে বম্বাইতে পালিয়ে গেলেন। ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত উঠেছিলো কিন্তু মামলা টেকেনি—শোনা গেলো মেয়েটি ডিভোর্স পেয়েছে আর ব্যারিস্টারটি তাকে বিয়ে করেছেন আর আগের স্ত্রীকে লিখে দিয়েছেন কলকাতার বাড়ি আর পাঁচশো টাকা মাসোয়ারা। লোকেরা তুড়ে গাল দিতে লাগলো দু'জনকেই, কয়েকটা কাগজও স্পষ্টভাবে নাম না-করে ব্যারিস্টার সাহেবকে তুলো ধুনে ছাড়লে। আমাদের বেলেঘাটার বাড়িতে বেশ জটলা হচ্ছে এ নিয়ে, সবাই দুয়ো দিচ্ছে, ছি ছি বলছে আর সকলের বিরুদ্ধে একলা লড়াই করছে নয়নাংশু। আমি একদিন রেগে গিয়ে বললুম, 'তা তুমি যাই বলো, ব্যারিস্টারটিকে লম্পট ছাড়া আর কিছু বলা যায় না!' 'কী যে বলো! লম্পটের কি জায়গার অভাব আছে কলকাতায়? আর ভদ্রলোকের ত্যাগটা তুমি কি দেখছো না!? কলকাতার জমজমাট প্র্যাকটিস হারালেন, আর এই জঘন্য লোকনিন্দা!' 'রেখে দাও তোমার ত্যাগ—একটা বুড়ো হাবড়া, এদিকে মেয়েটারও বিয়ে হয়েছিল—দুটোকে ধ'রে চাবকে লাল ক'রে দিলে ঠিক হয়।' নয়নাংশু গম্ভীর চোখে আমার চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ছেলেমানুষ, কিছু বোঝো না!'

এর পর থেকে নয়নাংশুর সঙ্গে মাঝে-মাঝেই তর্ক হতে লাগলো আমার। স্বামী-স্ত্রী, বা স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসাই হ'লো আসল কথা, ভগবানের চোখে বিয়ে ব'লে কিছু নেই, দাম্পত্যের নামে লাম্পট্য চলছে ঘরে-ঘরে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা না-থাকলে তাদের একত্র বসবাস গর্হিত, যেখানে মেয়েরা স্বামী আর আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার কোনো সুযোগই পায় না সেখানে তাদের তথাকথিত সতীত্বও একদম ঝুটা মাল এমনি সব তত্ত্বকথা আমাকে শোনায় নয়নাংশু, সবিস্তারে, অনেক উদাহারণ দিয়ে, যেন ক্লাশ পড়ানোর লেকচার দিচ্ছে। বলে, 'ভালোবাসারও পরীক্ষা হওয়া দরকার, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা

না থাকলে তা সম্ভব হয় না; যেহেতু অমুক মানুষটা কারো স্বামী, অথবা স্ত্রী, শুধু সেইজন্যে তাকে নিয়েই জীবন কাটাতে বাধ্য নয় কেউ; সম্পর্কটা যদি ব্যক্তিগত না হয়, যদি হয় মুখস্ত-করা নামতার মতো, কিংবা যদি অন্য কোনো উপায়ের অভাবেই তা আঁকড়ে থাকে লোকেরা, তা' হলে সেটাকে লোকেদের ওপর চাপানোর নাম জুলুম, আর তা মেনে নেয়ার নাম ভণ্ডামি। আর বেশিরভাগ মানুষ—বিশেষত এই সনাতন ভারতবর্ষে বিয়ে বলতে এখনো এই বোঝে।' নয়নাংশুর এ সব কথার কোনো সাফ জবাব আমার মুখে তক্ষুণি যোগায় না, কিন্তু শুনতে-শুনতে রাগ হয়—কেননা আমি তখন বিয়ে হওয়া নতুন বৌ, ক্ষুধিত কুমারীত্ব থেকে আরো ক্ষুধিত নারীত্বে প্রমোশন পেয়েছি, বিয়ে ব্যাপারটা আপাতত খুবই ভালো লাগছে আমার, এমনকি প্রায় বিশ্বাস ক'রে ফেলেছি যে এটা জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। একদিন বললুম, 'তাহ'লে তোমার মতে মানুষেরও কুকুর-বেড়ালের মতো হওয়া উচিৎ? ইচ্ছেসুখ চ'রে বেড়াবে—এই তো?' 'পশুর সঙ্গে মানুষের তুলনা হয় না—পশুরা ভালোবাসে না, তাদের শুধু শরীর আছে, মন নেই।' আমি হঠাৎ বললুম, ঐ এক কথা তোমার মুখে ভালোবাসা! ভালোবাসা! ব্যাপারটা কী বলতে পারো?' আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে জবাব দিলো, 'তা তুমি নিজে না-বুঝলে কেউ বোঝাতে পারবে না।'

আমি বিয়ের আগের নয়নাংশুর প্রেমে পড়েছিলুম, কিন্তু বিয়ের পর থেকে আমার মনে হ'তে লাগলো যে 'প্রেমেপড়া' ব্যাপারটা তেমন জরুরী নয়, বিয়েটাই আসল, বন্দেজি, একবার বিয়ে হয়ে গেলে সারা জীবনের মতো ভাবতে হয় না, আর সেইজন্যই—যা-ই বলুক না নয়নাংশু—পাতানো বিয়ের বিরুদ্ধে কোনো সত্যিকার যুক্তি নেই। আমি একদিন জিগেস করেছিলুম, 'তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এলে তুমি কি বিয়ে করতে না?' 'পাগল নাকি—যাকে চিনি না তাকে কি ক'রে বিয়ে করা যায়!' 'কিন্তু ধরো—এক সময়ে আমাকে তোমার ভালো লাগলো, অন্য সময়ে অন্য কাউকে আরো বেশি ভালো লাগে যদি?' নয়নাংশু একটু হেসে জবাব দিলে, 'সে-সম্ভাবনা সর্বদাই আছে, তাকে ভয় পেলে চলবে কেন?' আমার খারাপ লাগলো ওর কথা শুনে, জোর গলায় বললুম, 'আমি কিন্তু কল্পনাই করতে পারি না যে তুমি ছাড়া আর কেউ আমার স্বামী হ'তে পারতো, বা আমি ছাড়া আর-কেউ তোমার স্ত্রী।' আবার হাসলো নয়নাংশু, পিঠচাপড়ানো সুরে বলল, 'ছেলেমানুষ!'

এই কথাবার্তার কয়েকদিন পরে আমরা একটা গানের জলসায় গেলুম—আমার মা ছিলেন সঙ্গে—মুক্তিপদ ঘোষ প্রথমে একটা মালকোশ আর তারপর একটা লক্ষ্ণৌ চালের ঠুংরি গাইলে—অপূর্ব! নয়নাংশু একদম গান ভালোবাসে না, নেহাত আমার জন্য গিয়েছিলো আর কাঠের মতো মুখ ক'রে ব'সে ছিলো সারাক্ষণ; বেরিয়ে এসে মা যখন ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নয়নাংশু, তোমার কেমন লাগলো? চমৎকার—না?' তখন ও শুকনো গলায় জবাব দিলো, 'চমৎকার।'—কিন্তু আমার মন গানের রেশে ঝিম ধ'রে আছে, মনে পড়ছে ওস্তাদ গাইয়ের চোখ মুখ হাত নাড়া ইত্যাদি, হঠাৎ ব'লে উঠলাম, 'মুক্তিপদ ঘোষের স্ত্রী কী ভাগ্যবতী!' শুনে আমার মা তক্ষুণি বললেন, 'কী বোকার মতো কথা!'—কথাটা কেন বোকার মতো, তা বাড়ি ফিরে এসে অনেকক্ষণ পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম—'অমুকের স্ত্রী কী ভাগ্যবতী,' এ-কথা বলা মানেই আমি ঐ মহিলাটিকে হিংসে করছি, অর্থাৎ আমি সেই অমুকের স্ত্রী বা প্রেমিকা হ'তে চাচ্ছি—আর এ-কথা, কখনো মনে মনে ভাবলেও, কোনো বিবাহিতা মেয়ের মুখ ফুটে বলা উচিত নয়, বিশেষত তার স্বামী কাছাকাছি থাকলে। আর তখনই আমি বুঝেছিলাম বিয়ে জিনিসটা মানুষের কী-এক আশ্চর্য আবিষ্কার—ধরা যাক আমার যদি এখনো বিয়ে না হ'তো, তা'হলে যে-আমি আজ নয়নাংশুর প্রেমে পড়েছি সেই আমি যে কাল গান শুনে মুক্তিপদর প্রেমে প'ড়ে যেতুম না তার বিশ্বাস কী? কিন্তু আমি বিবাহিত ব'লেই ও-রকম ভাববো না, ভাবলেও চাপা দিয়ে দেবো, আমার মায়ের সঙ্গে একমত হবো যে ও-রকম ভাবা উচিত নয়। এইতো আমাদের 'প্রেম', নয়নাংশুর

ফলাও ক'রে তোলা 'ভালোবাসা'—তার উপর ভরসা রাখলে প্রত্যেকটা মানুষ কি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যেতো না, যদি না বিয়ে তাদের মজবুতভাবে বেঁধে রাখতো?

আবার বৃষ্টি এলো—ঠাণ্ডা ভেজা বাতাসের ঝাপট—তুমি এখন কী করছো, জয়ন্ত? ঘুমিয়ে পড়েছো? না চোখ বুজে আমার কথা ভাবছো? না খোলা চোখে তাকিয়ে আছো অন্ধকারে? না, তুমি নয়নাংশু নও, তুমি জয়ন্ত স্বাস্থ্যবান জোরালো পুরুষ তুমি, ম্লান রক্তের ভাবুনে মানুষ নও, তুমি ধারণায় চলো না, যে-জিনিসটা যা সেটাই তোমার কাছে ঠিক, খিদে পেলে খেতে হয়, প্রেম পেলে প্রেম করতে হয়, ও-সব কোনো তর্কের ব্যাপার নয় তোমার কাছে—আমি জানি তুমি কী করছো এখন। এতদিন তুমি ছটফট করেছো রাত্রে, কল্পনা করেছো রাত্রে, কল্পনা করেছো অন্য এক বিছানায় অংশুর সঙ্গে আমাকে, ঈর্ষা তোমাকে এক ঝাঁক মশার মতো যন্ত্রণা দিয়েছে, কিন্তু আজ তুমি পেয়েছো তোমার লোটনকে, ডাক্তারের ছুঁচের মধ্যে রক্তের মতো আমি তোমার হাতে উঠে এসেছি, তাই আজ অঘোরে ঘুমুচ্ছো তুমি, সারাদিন যারা গতর খাটে তারা যেমন অচেতন ঘুমোয় তেমনি এ ময়লা কাপড়ের বস্তার মতো উচু হ'য়ে প'ড়ে আছে তোমার বৌ। কাল সকালে তুমি নতুন উদ্যমে কাজে বেরোবে—প্রেসে ব'সে হুড়মুড় ক'রে পাঁচ কলম লিখে ফেলবে, ঘোরাঘুরি করবে বিজ্ঞানের জন্য—না, জয়ন্ত এয়ার-কণ্ডিশন আপিশে ব'সে তুমি দিন কাটাও না, তুমি রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ট্রামে-বাস-এ ঘোরাঘুরি করো সারাদিন, তুমি স্বাধীন, তুমি নির্ভীক—আমার জয়ন্ত! আমার প্রাণ! আমার আলো! তোমার জন্য আমার তেষ্টা পাচ্ছে, এই বৃষ্টির শব্দে তেষ্টা পাচ্ছে আমার—চলো সেই সুড়ঙ্গে আবার, যার ছাদ ফেটে স্রোত নেমে আসে—আমার তেষ্টা পাচ্ছে, কিন্তু জল আছে খাবার ঘরে আমি কেমন ক'রে উঠে যাই, যদি নয়নাংশু ন'ড়ে ওঠে, কিছু বলে, বা কোনোভাবে আমাকে বুঝতে দেয় যে সেও ঘুমোয়নি—যদি বাধ্য হই কিছু বলতে, যদি খোলাখুলি কিছু জিগেস করে নয়নাংশু—না, এখন তা চাই না, কেনো কথা-কাটাকাটি চাই না এখন, আমি এখন ভালোবাসছি—আমাকে ভালোবাসাতে দাও, শুয়েশুয়ে তোমাকে ভালোবাসছি, জয়ন্ত—না, এই ভালো, এই ভান, এই তেষ্টা নিয়ে শুয়ে থাকা নিঃশব্দে।

দুই

কিছু এসে যায় না।যাতে সত্যি এসে যায় তা হ'লো ইচ্ছে—ইচ্ছেটা মেটানো গেলো কি গেলো না সেটা একটা দৈব ঘটনা মাত্র। সুযোগ পেলে মিটবে, না পেলে মিটবে না; কোনো তফাত নাই। শিকলে বাঁধা কুকুরের মতো আমাদের শরীর, মন তাকে টেনে নিয়ে যায়—মন যখন যে দিকে ছোটে কেউ ঠেকাতে পারে না, কিন্তু শরীরটা জবড়জং জড় পদার্থ ব'লে পিছনে প'ড়ে থাকে। নতুন কিছু হয়নি, শুধু মনের হুকুম তালিম করেছে তোমার শরীর।মালতী, তুমি ব্যস্ত হোয়ো না, আমার দিক থেকে একই কথা, একই রকম আছে সব—কিছু এসে যায় না।

আলো জ্বেলে দেখলুম সুন্দর একটি ছবি। মালতী ঘুমিয়ে আছে, শাড়িটা উঠে গিয়ে নিটোল একটি পা দেখা যাচ্ছে হাঁটু থেকে পাতা পর্যন্ত, আঁচল স'রে গিয়ে একটি স্তন সম্পূর্ণ বেরিয়ে পড়েছে—সম্পূর্ণ গোল, নধর, ঊর্ধ্বমুখ। একটি শ্যামবরনী ভেনাস—বতিচেলির সদ্যতরুণী নয়, বরং টিৎসিয়ানোর কোনো ছাত্রের আঁকা পক্বযুবতী, সারা ঘুমন্ত শরীরের মধ্যে ঐ একটি অনাবৃত স্তন যেন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, রূপের চেতনা ও স্পর্ধা নিয়ে, লোকেদের অভিনন্দন নেবার জন্য। চুপচুপে ভেজা ঠাণ্ডা শিটোনো শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে আমার বেশ লাগছিলো,

যেন চোখ দিয়েই কিছুটা তাপ কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম ঐ ঘুমিয়ে- থাকা শরীর থেকে—কিন্তু মনে হ'লো হঠাৎ জেগে উঠলে হয়তো লজ্জা পাবে, তাই কাছে গিয়ে ওর গা না-ছুঁয়ে, আস্তে নামিয়ে দিলাম গোড়ালি পর্যন্ত শাড়িটা, স্তনটিকে ঢেকে দিলাম আঁচল দিয়ে। দেখলাম ওর চাদরটা নানা জায়গায় কুঁচকানো, ও ঘুমিয়ে আছে একটা বালিশে মাথা রেখে, অন্যটা মধ্যিখানে গর্ত নিয়ে পাশে প'ড়ে আছে। তারপর চোখে পড়লো আমার খাটের উপর ওর ব্লাউজ আর ব্রা—যেন তাড়াতাড়ি আন্দাজের ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিলো।

ভেজা কাপড় ছাড়তে বাথরুমে এসে আমার হঠাৎ মনে হ'লো আমি অনেকদিন পর উজ্জ্বল আলোয় মালতীর শরীর দেখলাম, মনে হ'লো আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে তার শরীর—না কি লোভনীয়? না কি সুন্দর? নাকি দু-ই? টান চামড়া, ভরপুর মাংস, চিক্কণ মেদ, যৌবনের মধ্যাহ্ন বলা যায়, এর পরেই হেলবে, হয় রোগা হ'য়ে যাবে নয় তো মোটা, হয় চামড়া ঢিলে হবে নয় তো চর্বি জ'মে জ'মে আকার-আকৃতি কিছু থাকবে না, আর তারপরেই আমার মনে হ'লো যে ও-রকম যে হ'তেই হবে তা নয়, মোটামুটি একই চেহারা নিয়ে (খাওয়াদাওয়া ও প্রসাধন বিষয়ে এখনকার মতোই যত্ন নেয় যদি) মালতী আরো দশ বছর—কুড়ি বছরও কাটাতে পারে; আমি এমন পঞ্চাশ বছরের মহিলাও দেখেছি যিনি বেশ—বেশ রমণীয়া (অবশ্য জানি না সাজগোজের জারিজুরি কতটা)—কিন্তু বুঝতে পারলুম আমি চাচ্ছি ওর রূপ নষ্ট হ'য়ে যাক, হ'য়ে যাক বেঢপ মোটা, বা বিতিকিচ্ছিরি রোগা, চাচ্ছি কোনো পুরুষ যেন ওর দিকে আর ফিরে না তাকায়;—কিন্তু আপাতত ওর শরীরের আকর্ষণ আমাকে মানতেই হ'লো, যে শরীর, শাড়ি-জামার খাপ-ছাড়ানো অবস্থায় পরিষ্কার আলোয়, অনেকদিন পর, এক্ষুণি আমি দৈবাৎ দেখতে পেলুম। সেই একটি স্তন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো আবার, কোথাও একটু ভাঁজ পড়েনি, বোঁটা ঘিরে কালো মণ্ডলটির রং একটু গাঢ় হয়েছে বোধহয় (ওর বুকে দুধ ছিলো প্রচুর, বুন্নিকে ও ছ-মাস পর্যন্ত বুকের দুধ খাইয়েছিলো), তালের মতো কালোর তলায় ঈষৎ গোলাপি তাকিয়ে আছে, যেন শিশুর মতো, কোনো চিরসুখী নিষ্পাপ চোখের মতো, যেন বলছে, 'এই আমি, আর-কিছু জানি না।'—কেন আমি আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকিনি, কেন আমি আঁচল দিয়ে ঢেকে দেবার সময়ও ওকে ছুঁলুম না? কেন আবার?—আমার ভব্যতাবোধ, শালিনতা-জ্ঞান, বেক্ষপনা! আমার বই-প'ড়ে শেখা আগডুম-বাগডুম! আমি—হাজার হোক ওর স্বামী—আমি ঐ মাংসপিণ্ড মুচড়ে দিয়ে জাগিয়ে দিতে পারতাম ওকে, ওর নরম গলাটাকে দু-আঙুলে চেপে ধ'রে খুলে দিতে পারতাম ঘুমোনো চোখ, ওকে জাপটে ধ'রে গড়াতে পারতাম আমাদের ছ ফুট ছওড়া মেঝেতে। কিন্তু না—আমার মতো ফুলবাবুর পক্ষে ও-সব কিছুই সম্ভব নয়। তা-ব'লে এমন নয় যে ও-সবে আমার ইচ্ছে নেই, লোভ নেই—পুরোমাত্রায় আছে, আর জানি ও-সব শ্রীমতীরও অপছন্দ নয়, আর তাই জয়ন্তকে দোষ দিতে আমি পারি না, শুধু যদি জয়ন্ত না-হ'য়ে অন্য কেউ হ'তো, আমার কোনো বন্ধু, যার সঙ্গে কাণ্ডিন্স্কির ছবি নিয়ে কথা বলা যায়!

বাথরুমে আমি ইচ্ছে ক'রে দেরি করলাম, যাতে ও জামা-টামা প'রে নিয়ে, বিছানাটাকে টান ক'রে নেবার সময় পায়। রাতের অন্ধকারে ছাড়া বিছানায় শাদা চাদর-বালিশ আমি সহ্য করতে পারি না, কিন্তু বেরিয়ে এসে দেখলুম মালতী তার বিছানাটা টেনে-টুনে দিয়েছে, কিন্তু সুজনিতে ঢেকে দেয়নি। ওর মুখোমুখি খেতে ব'সে জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়ছিলো আমার, মাঝে-মাঝে দম আটকে আসছিলো, কিন্তু আমি চেষ্টা ক'রে কথা বলতে লাগলুম আর ভালো লাগলো যে মালতীও জবাব দিলে সঙ্গে-সঙ্গে (দু-জনেই জানি কোন খেলা খেলছি)—চেষ্টা ক'রে খেতে লাগলুম আস্তে আস্তে আর সত্যি বেশ খিদেও পেয়েছিলো। বৃষ্টিতে জলে অতটা পথ হেঁটে এসে—অন্তত পাওয়া উচিত।এও ভাবলুম যে পেট ভ'রে খেলে তক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়া যাবে—কিন্তু না, আমি ক্লান্ত কিন্তু ঘুম নেই, আজকের বৃষ্টিতে আমি যেন বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছি, আমার গায়ে জোড়ে জোড়ে ব্যথা, যেন বাড়ি ফেরার পথে শেয়ালদার কোনো গুণ্ডার হাতে মার খেয়েছিলাম।

একবার সত্যি আমি মার খেয়েছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন, আমার কলেজের বন্ধু সুব্রতর সঙ্গে বাড়ি ফিরছি সন্ধ্যেবেলা, এইমাত্র দেখা 'ব্লু এঞ্জেল' ছবিটা নিয়ে কথা বলতে বলতে। বেলেঘাটা তখনও পাড়াগাঁর মতো ছিলো, সব রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো হয়নি, অনেক মাঠ ডোবা ঝোপঝাড় অন্ধকার ছিলো, হঠাৎ কোত্থেকে দুটো ষণ্ডামতো ছেলে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের উপর; 'স্কাউন্ড্রেল! আর যাবি ওখানে? আর ইতরামো করবি?' এই ব'লে আমাদের পিঠে মাথায় দমাদম কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে মাঠের মধ্যে শাদা ছায়ার মতো মিলিয়ে গেলো। তাদের মুখে ছিলো রুমাল বাঁধা, যাবার সময় রুমাল খুলে নিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছতে লাগলো—শুধু এইটুকু আমি দেখেছিলাম তাদের।

আমাদের হাতে বই-খাতা ছিলো, সন্ধের মিটমিটে আবছায়ায় খুঁজে-খুঁজে কুড়িয়ে নিলুম সেগুলো—একটা বই পাওয়া গেলো না, কিন্তু সেজন্যে সময় নষ্ট না-ক'রে নিঃশব্দে যে যার বাড়ি চলে গেলুম। আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি এ-রকম একটা ঘটনা ঘটবে বা ঘটতে পারে, এর আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়েছিলুম একেবারে—কী যে হ'লো তা বুঝে নেবারও সময় পাইনি। এই অবাক হবার, বোকা ব'নে যাবার অনুভূতিটা আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলো অনেকক্ষণ—গায়ের ব্যথা ভালো করে টের পেলুম না। আরো বেশি অবাক লাগলো যেহেতু ব্যাপারটা আমার দিক থেকে একেবারে অর্থহীন, এর কোনো সুদূরতম কারণও আমি ভাবতে পারছি না, সুব্রতকে বা আমাকে কেউ যে কেন মার দিতে চাইবে আমার পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছিলুম সেই রাত্রে—কে ওরা? ওদের রাগটা কিসের? আর সেই সূত্রে ঘটনাটা মনে-মনে আবার সাজাতে গিয়ে আমার হঠাৎ এ-কথা ভেবে চমক লাগলো যে আমরা চেঁচিয়ে উঠিনি,ফিরে মারা দূরে থাক আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিনি পর্যন্ত। ওরাও দু'জন ছিলো, আমরাও তা-ই—ধরা যাক ওদের গায়ে জোর ছিলো বেশি, কিন্তু অন্তত বাধা তো দিতে পারতাম, হয়তো বা দেখেও নিতে পারতাম লোক দুটো কারা। অথচ আমি মনে মনেও যেন মারতে পারলুম না ওদের, আমি কাউকে হাত তুলে মারছি তা ভাবতেই কেমন ঘেন্না করলো আমার, মারতে হলে অন্য একটা ঘেমো শরীরকে ছুঁতে হয়, এক বস্তা সম্পূর্ণ অচেনা মাংসপেশীর সঙ্গে পাতাতে হয় এক ধরনের আত্মীয়তা—না, আমি তা পারবো না। এসব কথা তখনই আমি ভাবিনি হয়তো—পরে, ধীরে ধীরে এগুলো আমার মনে হয়েছিলো; কিন্তু একটা কথা অস্পষ্টভাবে সেই রাত্রেই আমি অনুভব করেছিলাম; দুটো শরীরের যে কোনোরকম ঘনিষ্ট ছোঁয়াছুঁয়ি হওয়াটাই কুশ্রী।

অবশ্য এর একটা খুব বড়ো ব্যতিক্রম আছে, আর তাও আমার বুঝতে দেরি হয়নি, যদিও মেনে নিতে বেশ সময় লেগেছিলো। দু-বছর পরে আমরা তখন থার্ড ইয়ারে—সুব্রত আমাকে একদিন চুপি-চুপি বললে, 'ঐ কাণ্ডটা কে করেছিলো, জানো?' 'কোন কাণ্ড?' 'ঐ যে—তোমাকে আমাকে মেরেছিলো? বিমল—ইকনমিক্স অনার্সের বিমল গুপ্ত। সে আর-একটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে—' 'কী ক'রে জানলে?' বিমল বলেছে আমাকে! ওর রাগটা ছিলো তোমার ওপর, যেহেতু ও ভেবেছিলো তুমি বেনামীতে ওর বোনকে প্রেমপত্র লেখো আর ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো তাকে দেখার জন্য। আমাকে ফালতু মেরেছিলো।' 'ওর যে বোন আছে আমি তো তা-ই জানতুম না।' 'আছে আছে,' ব'লে সুব্রত জিভ দিয়ে একটা শব্দ করলো।

আমি তখনই জানলুম যে সম্প্রতি বিমলের সঙ্গে সুব্রতর বেশ ভাব জ'মে উঠেছে, সুব্রত মাঝে-মাঝে ওর বাড়িতেও যায়। এর পরে মাঝে-মাঝে এমনও হ'লো যে সুব্রত আর বিমলের সঙ্গে আমিও লিলি কেবিনে গিয়ে চা খেয়েছি, আড্ডা দিয়েছি। বিমলের উপর রাগ হয়নি আমার, বিমলের সঙ্গে ভাব করার জন্য সুব্রতর উপরেও রাগ হয়নি—আমার শরীরে রাগ এত কম কেন জানি না। কিংবা হয়তো রাগটা আমার মনের মধ্যে জমা হ'য়ে থাকে, আমি শরীর দিয়ে সেটা অনুভব করি না; মনে-মনে বলি, 'তোমাকে চিনে রাখলুম, তোমাকে আর ভালবাসবো না—,'

আমার রাগের প্রকাশটা বোধহয় এই রকম। তাতে অন্য লোকটার কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি নিশ্চিন্তে নিজের মনে থাকতে পারি; আমার মনে হয় আমি যে ওকে মনে-মনে ক্ষমা করছি না এতেই ওকে যথেষ্ট শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

বিমলের বাড়িতে সুব্রতর আকর্ষণ বিমল নয়, তার তিনটি বোন—চৌদ্দ, পনেরো, সতেরো তাদের বয়স। আমাকে একা পেলে মাঝে মাঝে ওদের গল্প করে সুব্রত। বড়োটির নাম মণিকা, সুব্রতের মতে 'খাশা চেহারা।' তিন বোনকে নিয়ে সে আর বিমল সিনেমায় যায় মাঝে-মাঝে, অন্ধকারে মণিকার পাশে ব'সে হাতে হাত রাখে সুব্রত, জুতো খুলে পায়ের উপরে পা দিয়ে চাপ দেয়, বসার ভঙ্গি বদল করার সময় দৈবাৎ গালে গাল ঠেকে যায় তাদের, ইত্যাদি। 'আমি ওর বোনকে প্রেমপত্র লিখি সন্দেহ ক'রে আমাকে মেরেছিলো বিমল, আর সে-ই এখন বোনদের সঙ্গে মেলামেশায় সুব্রতকে সাহায্য করছে—' এই কথাটা আমার তখন মনে হওয়া উচিত ছিলো কিন্তু তা হয়নি, আসলে এক ফোঁটা কৌতূহলও আমার ছিলো না, নেহাত ভদ্রতা ক'রে সুব্রতর কথা শুনে যেতুম। একদিন সুব্রত আমাকে বললে কাল রাত্রে ছাতে হঠাৎ একা পেয়ে সে কেমন ক'রে চুমু খেয়েছে মণিকাকে—অনেক, অনেকক্ষণ ধ'রে—মণিকাও সোৎসাহে তা ফিরিয়ে দিয়েছে; তার সেই বিস্তারিত বর্ণনা শুনে আমি অবাক হলাম, কেননা তখন পর্যন্ত আমি জানতাম না যে কবিরা যাকে চুম্বন বলেন তার মধ্যে মানুষের লালাসিক্ত জিহ্বারও কোনো অংশ আছে। একটু লজ্জাও করলো আমার, কেননা ঐ বর্ণনা শুনতে-শুনতে কুসুমকে আমার মনে পড়লো।

জানি না সব ছেলেরই ও-রকম হয় কিনা, কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময়টাতে আমি বড্ড কষ্ট পেয়েছিলুম। কী যন্ত্রণা আমার যখন চৌদ্দ বছর বয়সে প্রথম টের পেলুম যে আমার শরীরের মধ্যে আর-একটা শরীর লুকিয়ে আছে—চোখ নেই কান নেই কিন্তু ভীষণভাবে জ্যান্ত, কাপড়ের তলায় ওত পেতে-থাকা জন্তু একটা, আমারই অংশ কিন্তু হাত-পায়ের মতো আমার বাধ্য নয়, স্বাধীন, নিজের একটা আলাদা ইচ্ছে আছে, হঠাৎ যখন মাথা চাড়া দেয় আমি যেন চোখে অন্ধকার দেখি। আরম্ভ হয়েছিলো খুব মৃদুভাবে, এমন কি মধুরভাবে—আমাকে হানা দেয় সব নারী মূর্তি, হাওয়ার মতো সুরের মতো সুগন্ধের মতো, ভূগোলের খাতায় মেয়েদের মুখ আঁকি ব'সে ব'সে, ক্যালেন্ডারের ছবির তরুণীর সঙ্গে মনে মনে কথা বলি। কিন্তু এই মধুর খেলা ভেঙে দিয়ে আমার দ্বিতীয় শরীর আরো জোরালো হ'য়ে উঠলো, তার হিংস্রতায় আমি ভয় পেয়ে গেলুম, কিন্তু পারলুম না মাঝে-মাঝে নিজের হাতে তার দাবি না-মিটিয়ে, আর তার ফলে মনে হ'লো অপরাধ করেছি, মা-বাবার চোখের দিকে তাকাতে পারি না, আড়াষ্ট হ'য়ে থাকি—এদিকে স্কুলে এক মাস্টারমশাই, আর বাড়িতে এক পূর্ণযুবক আত্মীয়, আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অথচ স্পষ্টভাবে এমন সব ভুল উপদেশ দিতে লাগলেন যাতে আমার অপরাধবোধ আর অপরাধবোধের কারণ দুটোই আরো বেড়ে গেলো। শরীর-মনের এই রকম অবস্থা নিয়ে আমি স্কুল থেকে কলেজে উঠলাম।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে কেষ্টনগরে পিসিমার কাছে বেড়াতে এসে আমি প্রথম সচেতনভাবে কোনো মেয়েকে ছুঁতে পারলুম—জাঁক ক'রে বলার মতো কিছু নয়, দুই বোন, তেরো-চৌদ্দ বয়স, গয়না আর ছুটকি তাদের নাম, কবিতায় লেখার মতো কিছু নয়, গয়না ট্যারা, গোলগাল, আর ছুটকি হ্যালহ্যালে লম্বা, তার মুখের মধ্যে সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তার বড়ো বড়ো দাঁত যা না-হাসলেও খানিকটা বেরিয়ে থাকে,—জজকোর্টের কোনো এক টাইপিস্টবাবুর মেয়ে তারা, পিসিমাদের পাড়ায় থাকে, বিয়ের সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে ব'লে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। দিনের মধ্যে তারা অনেকখানি সময় কাটায় পাড়া বেড়িয়ে; যখন-তখন পিসিমার বাড়িতে চ'লে আসে, দারিদ্রের জন্যই হোক বা বহুসন্তানবতী মায়ের অমনোযোগের জন্যই হোক, তাদের জামাকাপড় সর্বদাই ময়লা আর শহুরে চোখে শোভনও নয়, তাছাড়া তরিবতও তেমন শেখেনি, হুট ক'রে ঢুকে পড়ে আমি যেখানে ব'সে-ব'সে পুরোনো বাঁধানো 'ভারতী' পড়ছি আমার ঘড়ি বই ফাউন্টেনপেন

নিয়ে নাড়াচারা করে; 'ঘড়িটা কোথায় পেলে?' 'কলমটা তোমাকে কে দিয়েছে?' 'অত বড়ো চুল রাখো কেন?'—এই রকম তাদের কথাবার্তার নমুনা; 'ওটা কী বই পড়ছো?' ব'লে মাঝে-মাঝে যখন নিচু হয় তখন ঢিলে শেমিজের মধ্য থেকে ঠেলে ওঠে তাদের যৌবনের প্রমাণ, কখনো কখনো এমন গা ঘেঁষে দাঁড়ায় যে তাদের নোংরা ঘেমো গায়ের বা আঁচলের গন্ধে আমার নাক চুলবুল করে ওঠে। পিসিমা মাঝে-মাঝে দেখতে পেয়ে বলেন, 'এখান থেকে ভাগ, অংশুকে বিরক্ত করিস না—।' ওরা তাড়া খেয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠে পালিয়ে যায়, কিন্তু সময়ে-অসময়ে ফিরে আসে, একা গয়না, একা ছুটকি, মাঝে-মাঝে দু-বোন একসঙ্গে; এমনি হ'তে-হ'তে আমি একদিন গয়নার শেমিজের উপর হাত রাখলুম, সে হাতটা তুলে নিয়ে শেমিজের মধ্যে সেঁধিয়ে দিলে। তারপর এই খেলা ছুটকির সঙ্গেও খেলতে হ'লো আমাকে, মাঝে-মাঝে দুবোনের সঙ্গে একই সময়ে। কিন্তু এ থেকে কোনো সত্যিকার সুখ পেলুম না আমি—আসলে আমার অনেক ভাল লাগে মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' বা সত্যেন্দ্র দত্তর কবিতা পড়তে—মেয়ে দুটোর প্রতি এমন অবজ্ঞা আমার যে তাদের ঠিক 'মেয়ে' ব'লেই ভাবতে পারি না—'মেয়ে' কথাটার মধ্যে যত স্বপ্ন আর কবিতা আমি ধীরে-ধীরে ভ'রে দিচ্ছিলাম তার কিছুরই সঙ্গে মিল নেই এদের, আমি চুমু খাই না পর্যন্ত, লুব্ধও হই না (কেননা চুম্বন হ'লো প্রেমের ঘোষণা, স্বাক্ষর, চুক্তিপত্র, আর এদের সঙ্গে আমার 'প্রেম' হওয়া অসম্ভব), এদের গায়ের দুর্গন্ধ কষ্ট দেয় আমাকে, এদের বোকা, অমার্জিত কথাবার্তায় আমি বিরক্ত হই, আমি এদের গায়ের মাংসে খাবল দিচ্ছি নেহাত একটা জন্তুর তাড়নায়। কিন্তু জন্তুরও তৃপ্তি নেই এতে; সে ঠিক কী চায় সে-বিষয়ে আমার ধারণাও তখন পর্যন্ত অস্পষ্ট; এদিকে মনে-মনে একটু ভয়ও আছে পাছে পিসিমা বা অন্য কারো কাছে 'ধরা প'ড়ে' যাই অথচ মেয়ে দুটো ঠিক এমন সময় আসে যখন আমি একা আছি, কাছাকাছি অন্য কেউ নেই, যেন সুযোগের জন্য ঘুরঘুর করে আশেপাশে, আর ভাবটা যেন আমি ওদেরই অপেক্ষায় ব'সে আছি। শেষটায় এই ব্যাপারটা কেমন ভোঁতা আর বিস্বাদ হ'য়ে উঠলো আমার কাছে, কলকাতায় ফিরে আসার সময় ভাবতে ভালো লাগলো যে গয়না আর ছুটকিকে আর দেখবো না।

কলেজে এসে একটা পরিবর্তন হ'লো আমার। আমি ছেলেবেলা থেকেই পড়তে ভালোবাসি; 'চয়নিকা'র অর্ধেক কবিতা আমার মুখস্ত, শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো বই পনেরো-কুড়িবার ক'রে পড়েছি, একবার সারারাত জেগে গোকুল নাগের 'পথিক' পড়েছিলুম—আর ঐ ঝড়ঝাপটার সময় আমি যে কোনো ভ'রেই বেসামাল হ'য়ে পড়িনি তার কারণই তা-ই। কলেজের লাইব্রেরিতে আরো বড়ো একটা আশ্রয়ের আমি সন্ধান পেলুম, আমার চোখ আর মন খুদে-খুদে ছাপার অক্ষরগুলোকে চেটেপুটে খেয়ে নিতে লাগলো, আর সেই খোরাক থেকে জোর পেয়ে-পেয়ে আমার মনে হ'লো আমি বয়ঃসন্ধির জ্বালাযন্ত্রণা কাটিয়ে, স্বাবলম্বী যুবক হ'য়ে উঠছি। আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগলো দু'জন রুশ লেখককে—টুর্গেনিভ আর চেখভ, এঁদের বই থেকে যেন উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়ালো আমার কৈশোরের স্বপ্ন—হাওয়ার মতো সুরের মতো সুগন্ধের মতো—মধুর, মধুর এক মেয়ে; পুরোনো বাড়ির বড়ো-বড়ো অন্ধকার ঘরে সে ব'সে থাকে শাদা পোশাক প'রে আমার জন্য, চাঁদের আলোয় ছায়াভরা বাগানে পাইচারি করে, ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে তার বড়ো-বড়ো করুণ চোখে সারা আকাশ দেখতে পাই আমি—এই মেয়ে, কিছুটা আমার মন-গড়া আর কিছুটা সাহিত্য থেকে তুলে নেয়া, সে আমাকে হানা দিতে লাগলো দিনে-রাত্রে, আমি বুঝে নিলুম যে এই বুকের দুরুদুরু, দীর্ঘশ্বাস, চোখের চাউনি, এই যে কথা বলতে গিয়ে থেমে যাওয়া আর চিঠি লিখতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলা, আর রাত ভ'রে মাথার মধ্যে এক গুনগুন গান—এরই নাম প্রেম, আর এই প্রেম আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে পবিত্র সম্পদ। এই 'প্রেম'কে একটা বাইরের চেহারা দেবার জন্য আমি কুসুমকে বেছে নিলুম।

'কুসুম, আমি তোমাকে ভালবাসি।' এই না-বলা কথাটা তাকে ঘিরে-ঘিরে ঘুরতে লাগলো কোনো বিগ্রহের সামনে ধূপের ধোঁয়ার মতো, সে বুঝে নিলে আমার কথাটা, চোখ দিয়ে সায় দিলো

তাতে, বুঝিয়ে দিলো সেও আমাকে 'ভালবাসে'। আমাদের দু-জনের মধ্যে একটা গোপন ব্যবস্থা এটা, একটা অলিখিত চুক্তিপত্র, প্রেমে পড়বো স্থির করেছি ব'লেই প্রেমে পড়েছি আমরা। কুসুম বয়সে আমার ছোটো হ'লেও সম্পর্কে এক ধরনের মাসি, সম্পর্ক নিকট নয় কিন্তু দু-বাড়িতে যাতায়াত মেলামেশা আছে, তার সঙ্গে আমার দেখাশোনার কোনো বাধা নেই।কিন্তু সুব্রত যে ভাবে তার মণিকার সঙ্গে এগিয়েছে, সে রকম কিছু কুসুমের সঙ্গে আমার হয় না কখনো—সাহস বা সুযোগের অভাবে নয়, ইচ্ছে করি না ব'লেই হয় না। মধুর, সুন্দর, পবিত্র এই প্রেম—আমরা কি পারি শরীর দিয়ে তাকে কলঙ্কিত করতে? দেখা হয় কথা হয়, দুরুদুরু করে বুক, চোখে-চোখে জ্বলে আলো, সে পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ঝাপসা একটা গন্ধ পাই, বৃষ্টিপড়া বিকেলে ব'সে ভাবি তার কথা—এ-ই যথেষ্ট, এর বেশি হ'লে সব নষ্ট হবে।

তবু—তবু—আমার শরীরটাকে বাগাতে পারি না আমি। জন্তুটাকে পোষ মানাতে পারি না। আমার নির্জনতম, মধুরতম মুহূর্তে সে আক্রমণ করে আমাকে—অন্ধ, বধির, লালাঝরা হাঁ-করা একটা মুখ, ঝোপের আড়াল থেকে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে আমার অতি কোমল ভাবনাগুলির উপর। এক এক সময় এত কষ্ট পাই যে জন্তুটার খিদে মেটাবার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, কিন্তু বড়ো রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকতে সাহস হয় না।

একবার আষাঢ় মাসে বৃষ্টি শুরু হ'য়ে আর থামে না, টানা সাতদিন বাড়িতে আটকে আছি—কলেজে তখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে—কোনো কাজ নেই, ধোপার দেখা নেই, ধুতি-জামা ময়লা, কোনো বই ভালো লাগছে না, সেই বিশ্রী বিরক্তিকর দিনগুলি ভ'রে আমার মনের মধ্যে শরীরের মধ্যে যে দাপাদাপি করতে লাগলো সে কোনো মানসপ্রতিমা নয়, কোনো কুসুমও নয়, একটা স্থূল জ্যান্ত মাংসল মূর্তি যার নিঃশ্বাস ঘন আর গরম, ঠোঁট ফেনায় ভেজা, হাত দুটো সাপের মতো প্যাঁচালো, যার মুখের মধ্যে চোখ নেই আর নাকের ফুটো দুটো অত্যন্ত বড়ো—এমন কোনো-কোনো সময় এলো যখন ও ছাড়া আমি আর-কিছুই ভাবতে পারি না। অবশেষে অসহ্য হ'য়ে উঠলো আমার, প্রথম যেদিন বৃষ্টি থামলো সেদিনই বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে, কোনো বন্ধুর খোঁজ করলাম না, কোথাও থামলাম না, একেবারে সোজা চ'লে এলাম সন্ধের পরে হাড়কাটা লেনে। আগে আর কখনো ঢুকিনি ঐ গলির মধ্যে, এক অদ্ভুত দৃশ্য আমার চোখের সামনে খুলে গেলো। আঁকাবাঁকা সরু গলির দুদিকে দাঁড়িয়ে আছে শরীর নিয়ে স্ত্রীলোকেরা—ছড়িয়ে, সার বেঁধে, ঘেঁষাঘেঁষি, আবছায়ায়, ল্যাম্পোস্টের তলায়, আরো সরু কোণে গলির ফাঁক ভর্তি ক'রে—আর পুরুষেরা তাকাতে তাকাতে এগিয়ে যাচ্ছে ফিরে আসছে, ছোটো-ছোটো দলে, কেউ বা গোমড়ামুখে একা, কেউ ছাতার তলায় মুখ লুকিয়ে, কেউ ছায়ার মধ্যে ছায়ার মতো মিশে গিয়ে, কেউ বা রিকশাতে—কেউ ঈষৎ টলছে, কেউ গুনগুন গাইছে, কারো হাতে বেলফুলের মালা জড়ানো—কেউ বা কখনো রসিকতা ছুঁড়ে দিচ্ছে আর তক্ষুণি তার জবাব আসছে টিনের মতো ক্যানকেনে গলায়—আর ভিতর থেকে উড়ে এসে পড়ছে গান, ঘুঙুর, হার্মোনিয়াম, হল্লা। বৃষ্টি টিপটিপ, কাদা, গলিটা এত সরু আর লোক এত বেশি আর ঘেঁষাঘেঁষি যে আমার মনে হচ্ছে যেন মাথার উপরে আকাশ নেই আমার, যেন প্রকাণ্ড একটা পোড়ো বাড়িতে ঢুকে পড়েছি আর আমার সাড়া পেয়ে ন'ড়ে উঠছে ছাতাপড়া দেয়াল থেকে উইয়ের স্রোত, ফাটা মেঝের গর্ত থেকে সারি সারি পিঁপড়ে, ঝাপট দিচ্ছে দুর্গন্ধি চামচিকে, ঠাণ্ডা ব্যাং লাফিয়ে উঠছে পায়ে—যেন পৃথিবীর যাবতীয় জীবন্ত নোংরার মধ্যে হঠাৎ পথ হারিয়ে ফেলেছি। বমি পাচ্ছে আমার, হৃৎপিণ্ড উঠে আসছে গলায়, চোখ ঝাপসা, কোমরের তলাটা প্রচণ্ড চাপে ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু আমি মনাস্থির ক'রে এসেছি আজ ফিরে যাবো না—যে-কোনো একটা মেয়ের সামনে থেমে পড়লুম। সে আমার গালে হাত বুলিয়ে বললো, 'একেবারে কচি ছেলে দেখছি। তা এসো ভাই এসো!' খানিকটা দুর্দ্বিধা আর আবর্জনা পেরিয়ে তার ঘরে এলুম—একতলার ঘর, একটি মাত্র জানলা, খাটে বিছানা মেঝেতে

ফরাশ দেয়ালে ছবিতে তিনটি মোটাসোটা যুবতীর শাড়ি উড়ে যাচ্ছে—আমি বেশ বয়স্কভাব ধারণ ক'রে মেয়েটাকে পাশে নিয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলুম, কিন্তু ভেবে পেলুম না এখন আমার কী বলা উচিত বা করা উচিত, কানের মধ্যে পিঁপিঁ আওয়াজ হ'তে লাগলো। বোধহয় আমাকে উৎসাহ দেবার জন্যই মেয়েটি ডিবে থেকে পান বের ক'রে বললে, 'খাবে?' আমি বিজ্ঞের মতো বললুম—কথা বলতে গিয়ে বড্ড মোটা শোনালো আমার গলা—'কী মসলা দিয়েছো তোমার পানে?' কী মসলা দিয়েছি পানে?' মেয়েটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, তার শাড়িটাকে দুহাতে ধ'রে বুক পর্যন্ত তুলে ফেললে, কোমর দুলিয়ে বললে, 'এই মসলা!' আর মুহূর্তে আমার সারা শরীর হিম হ'য়ে গেলো, বরফের মতো ঠাণ্ডা। তারপর দেখলুম মেয়েটা শুয়ে পড়েছে হাঁটু উঁচু ক'রে, শুনলুম একটা ভাঙা গলার আওয়াজ—'কী হ'লো? ব'সে আছো কেন?'—কিন্তু আমি কিছুতেই আর জন্তুটাকে খুঁজে পাচ্ছি না। সে কুঁকড়ে গা ঢাকা দিয়েছে গর্তের মধ্যে, আমি তাকে যতই বলছি, 'বেরিয়ে আয়! বেরিয়ে আয়, জোচ্চোর!' ততই সে গুটিয়ে যাচ্ছে পোকার মতো। আমাকে দরজার কাছে দেখে তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা, আমি কয়েকটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ঘেন্না—কিন্তু ভোলা যায় না যে ব্যাপারটা, ও সব মেয়েরই শাড়ি-জামার তলায় শরীর আছে। কুসুম—এমনকি কুসমেরও। হয়তো ক্লাশে বসে আছি, মাস্টারমশাই ফরাশি বিপ্লব পড়াচ্ছেন, হঠাৎ আমার মনে সামনে ভেসে উঠলো একটা ছবি: বাথরুমে কুসুম খুব নির্দোষ ও প্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্যকর কাজ করছে, ও-সব তাকেও করতে হয়, আর অমনি ক'রেই শাড়ি তুলে ধরতে হয় তখন। আমি মনে-মনে চীৎকার করি—'না, না, এ আমি মানবো না, এ মিথ্যে, এ অসহ্য!'—দুই হাতে আঁকড়ে ধরি বাতাসের মতো অন্য এক কুসুমকে—শাদা নক্সা পোশাক তার পরনে, এক পুরানো বাড়ির বড়ো-বড়ো অন্ধকার ঘরে স্বপ্নের মতো তার ঝিলিমিলি। কুসুম, তুমি আমার প্রেম, তুমি আমার স্বপ্ন।

অন্য একটা কারণে আমি কষ্ট পেতুম মাঝে-মাঝে, যখন আমার সন্দেহ হতো, যে অন্য ছেলেদের তুলনায়—ধরা যাক সুব্রতর তুলনায়, আমি যথেষ্ট তুখোড় নই। আমি পরীক্ষায় উঁচু নম্বর পাই, অনেক দেশের অনেক বই পড়েছি, কিন্তু ওরা যে-সব খিস্তি বুলি আড্ডায়, যে-সব কথা বলাবলি ক'রে চায়ের টেবিল ফাটিয়ে দেয় এক-এক সময়, আমি সেগুলো বুঝতেই পারি না, আর ওরা যখন অনেক চেষ্টা ক'রে আমার মগজের মধ্যে সেঁধিয়ে দেয় অর্থটা, তখন আমি লাল হ'য়ে হাতের পাতায় মুখ লুকোই। আমি যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ছি তখনও আমি জানি না স্ত্রী-পুরুষের মিলনের পদ্ধতিটা ঠিক কী-রকম, আর মাতৃগর্ভ থেকে সন্তানই বা ঠিক কোন রাস্তায় বেরিয়ে আসে, আর এ-সব ব্যাপার আড্ডায় শোনা, বাড়িতে বয়স্কদের মুখে শোনা নানা কথা মনে-মনে জোড়াতালি দিয়ে, আমি যেদিন সত্যি বুঝতে পারলুম সেদিন আমার লজ্জায় ম'রে যাবার দশা হ'লো। ছি! কী কুৎসিত! কী জঘন্য! এই কি করতে হয়েছে সকলকে, করতে হবে সকলকে—শুধু বেশ্যাদের সঙ্গে নয়, নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও—আমার মা-বাবা, তাঁরাও ? ছি! অন্য রকম কেন হ'লো না, ঠোঁটে ঠোঁটে চুমু খেলে যদি সন্তান হ'তো, নিশ্বাসের সঙ্গে নিশ্বাস মেশালে, বা কোন মেয়ে বা পুরুষ যদি একা-একা জন্ম দিতে পারতো, যেমন লেখা আছে মহাভারতে বাইবেলে—যে-কোনো, অন্য যে-কোনো উপায় কি সম্ভব ছিলো না? এই একটা ব্যাপার একেবারে মেরে রেখেছে আমাদের, কেমন ক'রে আমাদের প্রেম হবে সুন্দর—আর পবিত্র—আর মধুর যখন তার তলায় এই পাঁক, এই নোংরা, এই ঘেন্না? ধরা যাক কুসুমের সঙ্গে যদি কোনদিন আমার বিয়ে হয় তাহ'লেও কি—না, কিছুতেই না, অসম্ভব!

কুসুমের যখন বিয়ে হ'লো আমি তখন এম. এ. পড়ছি। আমি কিছুটা কষ্ট পেলুম যেহেতু ইচ্ছে হ'লেই তাকে আর দেখতে পাবো না (তার স্বামী ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট, মফস্বলে থাকেন), কিন্তু মনের তলায় সুখীও হলুম এই ভেবে যে চেখভের গল্পের মতো আমার এটাও ব্যর্থ প্রেম হ'লো। মনে

মনে বললুম, 'যে প্রেম বিয়োগান্ত সেটাই বেশি গভীর, কুসুম আমারই রইল—সুর, স্বপ্ন, সুগন্ধ হ'য়ে।' শরীরটাকে বাদ দিলেই প্রেম সত্য হয়, আর যাতে শরীরের অংশ আছে সেটা প্রেম হ'তেই পারে না, এই ধারণা তখনও আমাকে ছেড়ে যায়নি। কিন্তু একবার একটু অন্যরকম অভিজ্ঞতা হ'লো আমার—কুসুমের সঙ্গেই।

বিয়ের কয়েক মাস পরে কুসুম কলকাতায় এলো, ওর স্বামী ইস্টারের ছুটি কাটিয়ে দিনাজপুরে ফিরে গেলেন। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসে কুসুম—বিয়ের পর স্বাধীনতা অনেক বেড়ে গেছে তার, আমার সঙ্গে ব্যবহার অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ, আমি তাকে মনে-মনে 'প্রেমিকা' বলে ভাবি আর ঐ ভূমিকা মেনে নিতে তারও আপত্তি নেই—চোখে চোখে এই বার্তা বিনিময় করি আমরা। একদিন—সে-রাতটা আমাদের বাড়িতেই ছিলো সে—রাত্রে খাওয়ার পর কুসুম আমার ঘরে এলো—তেতলার কোণের ঘর সেটা—আমার বিছানায় বসে আজেবাজে গল্প করলো অনেক্ষণ, আস্তে—আস্তে নিঝুম হ'য়ে এলো বাড়ি, কুসুম বললে, আমার ক্লান্ত লাগছে, একটু শুয়ে নিই। বালিশে মাথা রেখে বললে, সুন্দর জ্যোছনা, আজ আলোটার কি দরকার আছে—চৈত্রমাস, জলের মতো জ্যোছনা, পাগলের মতো হাওয়া, চাঁদের আলো তার ঠোঁটে আর গালে, চোখ আরো কালো আর গভীর—শুধু চুমো খেয়ে খেয়ে সেই রাতটা কাটিয়ে দিলুম আমরা, সুব্রত যে রকম বর্ণনা দিয়েছিলো তেমনি। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলুম না, আমার হ'ত দুটো একেবারে বেকার রইলো, শুধু ঠোঁট খুলে শুষে নিলাম তার মুখের নিশ্বাস—সুগন্ধি ভেজা ফেনা যেন অফুরন্ত, শিয়রে ব'সে নিচু হয়ে ডুবিয়ে দিলাম আমার মুখ ঐ সুস্বাদু উৎসের মধ্যে—শুধু এ-ই, আর—কিছু নয়—কামনা ও সংযম, সাধ্বিতা ও সম্ভোগ, ব্রহ্মচর্য ও ইন্দ্রিয়-বিলাসের এক অদ্ভুত মিশ্রণে কেটে গেলো সেই হাওয়ায় আর জ্যোছনায় উতল রাত্রিটা। আশ্চর্য এই যে অন্য কোনো ইচ্ছে জাগলো না আমার, কুসুমও এমন কোনো ভঙ্গি করলে না যে আরো কিছু চায়, হয়তো ভাবছিলো ওইটুকুই নিরাপদ কিংবা হয়তো নিরাশ হয়েছিলো আমার ব্যবহারে—তারপর সে আর রাত কাটায়নি আমাদের বাড়িতে, পাছে আরো এগোতে হয় সে-কথা ভেবে ইচ্ছে ক'রেই এড়িয়ে গেছে হয়তো—কিন্তু আরো এগোবার কথা, আশ্চর্য, আমার মাথাতেই খেলেনি আমার কোনো অতৃপ্তি ছিলো না, আমি তখনও ছেলেমানুষ তখনও রোমান্টিক—তারপর কয়েকটা দিন যেন সারাক্ষণ ঘোরের মধ্যে কাটলো আমার, স্নায়ুতন্ত্রে এক নতুন শিহরণ, মুখের মধ্যে এক নতুন সুগন্ধ, যেন আমার স্বপ্নকে আরো কাছে পেয়েছি, প্রমাণ পেয়েছি, স্বপ্নটা নেহাত বইয়ে পড়া ব্যাপার নয়।

আমার বিয়ের রাত, আজকের মতোই রাত ভ'রে বৃষ্টি, আজকের মতোই পাশাপাশি শুয়ে নির্ঘুম ছিলো সেই রাত্রি, কিন্তু ঠিক আজকের মতো নয়। এক বছরের মেলামেশা উৎকণ্ঠিত আশার পরে কাছে পেয়েছি মালতীকে, তার পাশে শুয়ে আছি মেঝের উপর নতুন জাজিমের বিছানায়, জাজিমের উপর চিকন্‌পাটি পাতা, ঘরের কোণে তেলের দীপ জ্বলছে! হিন্দুমতে বিয়ে হয়েছিলো আমাদের (আমার তাতে মন ছিলো না), ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জি রোডে ভাড়া বাড়িতে লগ্ন রাত দেড়টায়, পালা ফুরোতে আরো কত বাজলো কে জানে—মালতীকে আবার উপোস করিয়েও রেখেছিলেন তার মা—আগে ভাবতুম ক্লান্তিকর, বিরক্তিকর,সময়ের এ-রকম অপব্যয় আর কিছু নেই, কিন্তু ঘন্টাগুলি কেমন ক'রে কেটে গেল টের পেলুম না, আমি শুয়ে আছি মেঝের উপর নতুন জাজিমের বিছানায়, ঘরের কোণে পিলসুজে পিতলের প্রদীপ, সারা ঘরে ছায়া, সারা ঘরে জুঁইফুলের গন্ধ, টাটকা নতুন বেনারসির ফিশফিশে আওয়াজ, আমি তাকে ভালো দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু অনুভব করছি প্রতিটি রক্তকণিকায়, একটা প্রকাণ্ড পাকা আতার মতো ফেটে যাচ্ছি আমি, যেন সব বীজ ছিটকে বেরিয়ে আসছে—স্তব্ধতা, রাত্রি নিবিড়, বৃষ্টির শব্দ, আমি একবার চুমু খেলাম তাকে, ঠিক চুমুও নয় শুধু ঠোঁটের উপর ঠোঁট ছোঁয়ালাম একবার, পালকের মতো হালকা, একবার হাত রাখলাম তার স্তনের উপর—পাখির মতো নরম, আর উষ্ণ, আর জীবন্ত—মনে হ'লো আমার

হাতের তলাতেই তার হৃৎপিণ্ড টিপটপ করছে, মনে হ'লো তার এলিয়ে-থাকা হাতের মুঠোয় আমার হৃৎপিণ্ড—শুধু এ-ই, আর কিছু নয়, রাত ভ'রে বৃষ্টির শব্দ, আমরা একজনও ঘুমোইনি শুধু পাশাপাশি শুয়ে অনুভব করেছি পরস্পরকে—আমরা এখন বিবাহিত, স্বামী-স্ত্রী, প্রাণ যা চায় রক্ত যা বলে তা-ই আমরা করতে পারি এখন, কিন্তু কিছু না করাটাই আমার মনে হলো ভালো—সুন্দর—আনন্দময়—আমি এখন তাকে পেয়েছি তাই অপেক্ষা করাটাই চরিত্রবান—বলো, মালতী, তুমিকি নিরাশ হয়েছিলে?

বিয়ে ক'রে আমি সুখী হয়েছিলাম—সচেতনভাবে, পরিপূর্ণভাবে সুখী। মালতীর সঙ্গে আমার চেনা হবার কিছুদিন পরেই টের পেলুম যে আমি ওর শরীরটাকে আকাঙ্ক্ষা করছি, আমার কাছে অন্তহীনরূপে কাম্য হ'য়ে উঠেছে ওর চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত শরীর—অথচ আমার প্রেমের স্বপ্নকে তা মলিন ক'রে দিচ্ছে না বরং গাঢ় করে তুলছে। যে-সব অবস্থায় কুসুমকে কল্পনা ক'রে আমি আতকে উঠেছি সবই যেন মালতীর পক্ষে শোভন; ওর শরীরের কোনো প্রকাশ নেই যা অসুন্দর, আমার মনে হয় ওর গালের ঘাম আমি চেটে নিতে পারি, ওর চিবানো খাবার খেয়ে নিতে আমার বাধবে না, যেদিন গিয়ে দেখি ও মাসিকের ব্যথায় কাতর হ'য়ে শুয়ে আছে সেদিন ওর প্রতি আমার আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়। এই সেই মেয়ে, যাকে আমি একই সঙ্গে ভালোবাসতে আর ভোগ করতে পারবো—তাই আমার মনে হ'লো তখন—ওরই কাছে এসে এতদিনে আমার শরীর-মনের ঝগড়া মিটে গেলো। এতদিন যেন দু-টুকরো হ'য়ে অস্থিরভাবে বেঁচে ছিলাম, এবারে আমার দুই অর্ধেকে জোড়া লেগে গেলো, আমি আস্ত একটা মানুষ হ'তে পারলাম। আমার বিয়েতে, আর মালতীর মধ্যে এইটেই আমার মনে হ'লো সবচেয়ে আশ্চর্য আর সবচেয়ে সুন্দর—এই যে আমার মন এখন জন্তুটার সঙ্গে দোস্তালি পাতিয়েছে, জন্তুটাও রোগা হ'য়ে যাচ্ছে না অথচ আমার মনের মধ্যে গুনগুন সুর আর সুগন্ধ আমাকে বাতাসের মতো ঘিরে আছে—জীবনে এই প্রথম আমার নিজেকে মনে হ'লো পুরোপুরি মানুষ, পুরোপুরি পুরুষ, স্বাধীন, আত্মস্থ, স্বাবলম্বী।

কিন্তু তাও, তাও তোমার ছেলেমানুষি, নয়নাংশু, প্রথম থেকেই তোমার বিয়ে ছিলো ফাঁকি—আর তা মালতীর নয়, তোমরাই দোষ। অসীম তোমার অবজ্ঞা সেই সব বাঙালি যুবকদের উপর যারা লাভের জন্য হিশেব ক'রে বিয়ে করে—রূপ, শ্বশুরের টাকা, সামাজিক মর্যাদা, সব এক বঁড়শিতে গাঁথার আশায় এম. এ. পাশ ফ্যাশনেবল চাকুরে হ'য়েও বিজ্ঞাপন দেয় খরবকাগজে, কিংবা যারা 'প্রেম বিবাহ' করে বন্ধুদের কাছে তাদের রাত্রিবেলার নতুন-নতুন অভিজ্ঞতার গল্প করে রসিয়ে। কিন্তু তুমি, পঁচিশ বছরের টগবগে যুবক, তুমিই বা কি-রকম প্রেমিক আর স্বামী ছিলে জিগেস করি? মনে আছে—বিয়ের আগে মালতী যখন কালিম্পঙে বেড়াতে গেলো তার মা-র সঙ্গে, তুমি যে সব লম্বাচওড়া চিঠি লিখতে সেগুলিকে মালতী কেমন ঠাট্টা ক'রে বলতো 'আবহাওয়া-সংবাদ'! যে উপন্যাস তুমি কখনো লিখতে পারবে না তারই কয়েকটা ছেঁড়া পাতা ছিলো সেই চিঠিগুলো—মেঘলা দিন, সেদিনকার কাগজের কোনো খবর, চৈত্রের দুপুরে চৌরঙ্গির ট্রাম—এমনি সব বিষয়ের ছুতোয় তুমি নিজের মনটাকে খুলে দেখাতে যেন মালতী তোমার কোনো পুরুষ-বন্ধু—মেয়ে নয়, প্রণয়িনী নয়, যেন তোমার চিঠিতে সে এই কথাটা শুনতে চাচ্ছে না যে তার অভাবে তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছো! কিন্তু ঐ কথাটা তুমি কখনো লিখবে না—যদিও সেটাই সত্য—তা লিখতে তোমার আত্মসম্মানে বাধে, সেটা সাধারণত, সেটা 'অন্যদের মতো'! ভেবে দ্যাখো বিয়ের পরে প্রথম ক'মাস, তুমি তাকে কবিতা প'ড়ে শোনাও, বেছে-বেছে বলো পুরাণ ইতিহাস সাহিত্য থেকে বাছা-বাছা প্রেমের কাহিনী, বুঝেও বোঝো না সে বিরক্ত হচ্ছে, শুনছে না, হাই চাপছে—যখন তোমার প্রেম করার কথা তখন প্রেম বিষয়ে কথা ব'লে ব'লে অমূল্য সময় হেলায় নষ্ট করো, লক্ষ্যও করো না যে তোমার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালোবাসতে পারছো না তুমি, তাকেও যথেষ্ট সুযোগ অথবা অবকাশ দিচ্ছো না তোমাকে ভালোবাসার। আর আজ—আজ তো দেখছো

যে—প্রেম নিয়ে চৌদ্দ বছর বয়স থেকে এত কথা তুমি ভেবেছো আর বলছো তার সত্যিকার চেহারাটা কী—ঐ জয়ন্ত, স্থূল, অশিক্ষিত, বেপরোয়া, তারই জন্য আজ খুলে গেল টিৎসিয়ানোর কোনো ছাত্রের আঁকা পক্বযুবতী শ্যামাঙ্গী এক ভেনাসের শরীর। আর, তুমি, শুয়ে শুয়ে ভাবছো, শুধু ভাবছো—যেমন ভেবেছো জীবন ভ'রে, বড্ড বেশি ভেবে-ভেবে তুমি অক্ষম হ'য়ে গিয়েছো, নয়নাংশু। তা না-হ'লে এতদিনে কি অপর্ণার দিকে আর একটু বেশি মনোযোগ দিতে না?

কী করতে বলো আমাকে? মালতীকে ছেড়ে দিয়ে অপর্ণাকে বিয়ে করবো? বোকা—বিয়ে কেন করতে হবে? আর কত স্পষ্ট ক'রে একজন ভদ্রমহিলা জানাতে পারে যে সে এমনিতেই রাজী? স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর থেকে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে অপর্ণা, নিজে চাকরি ক'রে চালায়, ছেলে-পুলে নেই ঝামেলা নেই, চমৎকার—তোমাকে তার পছন্দ, আর তোমারও যে তাকে খারাপ লাগে তা তো নয়। তাহ'লে কেন ক্ষণিকের মধু লুটে নেবে না ফুল যদি এগিয়ে আসে? কিন্তু আখেরে যদি প্রেমে প'ড়ে যাই, যদি সত্যি ভালোবেসে ফেলি? তবে তো আরো ভালো; বেশ খানিকটা দুঃখ নিয়ে বিলাস করতে পারবে। না, আমি আর ঝড়-ঝাপট চাই না, আমি নিরিবিলি নিজের মনে থাকতে চাই, ঐ নৈশ অনুষ্ঠান বাদ দিয়েও কাটাতে পারবো জীবনটা, বাদ দেওয়াটাই অভ্যেস হ'য়ে গেছে মালতীরই সৌজন্যে।—ভীতু, অক্ষম! শরীরকে তোমার ভয়, ভালোবাসাকে তোমার ভয়। ভালোবাসাকে নয় হয়তো। একই—ও দুটো জিনিস একই, নয়নাংশু ভালোবাসায় শরীরই আসল—আরম্ভ, শেষ, সব ঐ শরীর। আধা-বয়সী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অত ঝগড়াঝাঁটি খিটিমিটি কেন? যেহেতু তাদের শরীর প'ড়ে আসছে! বুড়ো স্বামী-স্ত্রীরা নানাভাবে উৎপীড়ন করে কেন পরস্পরকে? যেহেতু তাদের শরীর ম'রে গেছে। প্রতিহিংসা—প্রকৃতির উপর প্রতিহিংসা। ভালোবাসা জৈব, ভালোবাসা যৌন, শরীর না-থাকলে কিছুই থাকে না ভালোবাসার। বিদ্যুতের মতো, বৈদ্যুতিক সংস্পর্শের মতো—শরীরের সঙ্গে শরীরের প্রেম। ঘরে সব সময় আলো জ্বালাতে হয় না কিন্তু সুইচ টিপলেই জ্ব'লে ওঠে, যেহেতু তারের মধ্যে বিদ্যুৎ চলছে সব সময়। এও তেমনি। আছে শরীরে শরীরে বৈদ্যুতিক যোগ, তাই যখন প্রেম করো না তখনও থাকে প্রেম, শিরায়-শিরায় ব'য়ে চলে সারক্ষণ—তাই কথা মধুর, হাসি মধুর, কাছে থাকা মধুর, দূরে যাওয়া মধুর কলহ মধুর কলহের পরে মিলন আরো বেশি মধুর। সবই শরীর। সেই যোগ আজ নষ্ট হ'য়ে গেছে তোমার সঙ্গে মালতীর, শরীরে-শরীরে বিদ্যুৎ আর ব'য়ে যায় না, তাই—যতই তুমি সুইচ টেপো মিস্ত্রি ডাকো আলো আর জ্বলবে না, পাওয়ার-হাউস ফতুর হ'য়ে গেছে। কিন্তু অন্য কোথাও তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ, তোমার আর অপর্ণার মধ্যে, খোরাক না-পেয়ে ম'রে যাচ্ছে, তোমার শরীর তাকে আবার জাগাতে পারবে অপর্ণা, সে পারবে তোমাকে যৌবন ফিরিয়ে দিতে—ওঠো, জেগে ওঠো, নয়নাংশু, মনস্থির করো, কাল তুমি অপর্ণাকে ডিনারে বলবে পার্ক স্ট্রীটের কোনো রেস্তোরাঁয়, প্রচুর মদ খাবে এবং খাওয়াবে—তারপর যাবে তার ফ্ল্যাটে, তাকে ট্যাক্সিতে পৌঁছিয়ে দেবে আর সে বলবে একটু আসুন এক পেয়ালা কফি খেয়ে যান—তোমার ভীরুতা ছাড়া কোনো বাধা নেই, নয়নাংশু, তোমার চল্লিশ হ'তে আর দেরি কী, এখনো কী শক্তপোক্ত পুরুষ হবে না?

তিন

যেন একটা বাঁধ ভেঙে গেলো—বন্যা—বন্যা আমাকে নিয়ে গেলো ভাসিয়ে, কিংবা যেন মস্ত কালো মেঘ সকাল থেকে জ'মে ছিলো স্তব্ধ—কালো, আরো কালো, একটা আবছা নীল গুমোট গরম সুড়ঙ্গের মতো হ'য়ে উঠলো দিনটা তারপর সন্ধেবেলা হঠাৎ গর্জনে ফেটে পড়লো অঝোর, মুচড়ে

ছিঁড়ে নিংড়ে নিলো আমার শরীরটাকে—নিঃশেষে। এই তুমি করেছো আমাকে, জয়ন্ত, আমি তোমার জন্য একশো লোটন হ'য়ে উঠেছিলাম, আমার ছোট্ট শরীরটার তলায় অমন প্রকাণ্ড একটা কালো মেঘ কোথায় লুকিয়ে ছিলো এতদিন? তবে কি নয়নাংশুকে আমি কখনোই ভালোবাসিনি? বাসিনি তা নয়, কিন্তু ওকে আমি পুরোপুরি কখনো দিইনি নিজেকে—এতদিনে সেটা বুঝতে পারছি—একটা অংশ সরিয়ে রেখেছি না জেনে—সেই গোপন গভীর চরম অংশ তোমারই জন্য আমি জমিয়ে রেখেছিলাম, জয়ন্ত! সে আমার স্বামী, রাতের পর রাত বছরের পর বছর আমি শুয়েছি তার পাশে, তার আর আমারই সন্তান বুন্নি—কিন্তু ও-সবে কিছু এসে যায় না। কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে, বিনা চিন্তায় বিনা ইচ্ছায় বিনা ভালোবাসায় কি স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান আসে না? আমি এখন বুঝতে পারছি যে সাত সন্তানের মা হ'য়েও কোনো মহিলা কুমারী থেকে যেতে পারেন—হয়তো ঘরে ঘরে এমন গৃহিণী অনেক আছেন যাঁরা একটা বোবা শরীর নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবন, আর তা তাঁরা জানেন না পর্যন্ত। আমিও কি জানতাম আমার গোপন রহস্য, জয়ন্তর সঙ্গে দেখা না হ'লে? অংশু পারেনি—নতুন বিয়ের পরেও কখনো পারেনি আমাকে নিজের মধ্য থেকে এমনি ক'রে টেনে বের ক'রে আনতে, ভাসিয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দিতে যেন অঝোর মেঘ ঝ'রে ঝ'রে পড়লো—নিঃশেষে, নিঃশেষে।

মেয়েরা কখন জানতে পারে যে তারা মেয়ে, মেয়েমানুষ? সকলের বোধহয় এরকম হয় না, আমি ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলেছিলুম হঠাৎ একদিন আমার ফ্রকে রক্তের দাগ দেখে। স্কুলে ছিলুম তখন, টিফিনে লুকোচুরি খেলছি। শাড়ি-পরা মেয়েরা হাসলো আমার কান্না দেখে, হেডমিসট্রেস সঙ্গে দাই দিয়ে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ভেবেছিলুম আমার কোন সাংঘাতিক অসুখ করেছে, হয়তো মরেই যাবো, মা আমাকে শান্ত করলেন, আদর করলেন। তাঁর মুখের দু-একটা কথা শুনে হঠাৎ একটা ঝাপসা অনুভূতি হ'লো আমার; সেই বারো বছর বয়সেই যেন বুঝে নিলুম যে সব স্ত্রীলোক সমবয়সী, এক রহস্যময় জগতের সমান অংশীদার, যাতে পুরুষের কোনো অংশ নেই কিন্তু অধিকার আছে, যা আসলে পুরুষেরই জন্য তৈরি হয়েছে, হচ্ছে, অথবা হয়েছিলো। আমার অবাক লাগত ভাবতে যে আমাকেও খুঁজে পেয়েছে সেই রহস্য, এই ক্লাস সিক্স-এর বেণী-দোলানো বাচ্চা মেয়েকে—একটু গর্বও হ'লো। তেরোতে পড়ার আগেই আমাকে শাড়ি ধরিয়ে দিলেন আমার মা—বাঙালি মেয়েদের জীবনে সেটা একটা বিরাট দীক্ষা, সেকেলে বামুন ছেলেদের পৈতে হওয়ার মতো—শাড়ি; প্রথমে যতই বিশ্রী লাগুক, মনে হোক স্কিপিং রোপ-এর ছুটোছুটির শত্রু, তবু—সেটাই নারীত্ব, সেটাই রূপ, সেটাই সম্মান। কী করুণ চেষ্টা আমার ফুটে-ওঠা বুকের রেখা ঢাকতে—কী লজ্জা তা নিয়ে, ঘুমোবার আগে নিজেকে মুড়ে রাখি আঁচলের এনভেলপে, ভিতরে একটা লাখ টাকা দামের চিঠি আছে তা জানি ব'লেই। হঠাৎ একদিন আমার চোখে পড়লো—যা বাড়ির আর কেউ লক্ষ্য করেনি—যে আমাদের বাথরুমের দরজায় ছোট্ট একটা ফুটো আছে, ছোট্ট, একরত্তি, আমার কড়ে আঙুলের ডগাও তাতে ঢোকে না, কিন্তু—আমি নিরিবিলি সময়ে অনেক পরীক্ষা ক'রে প্রমাণ পেলুম—এক চোখ বুঝে অনেকক্ষণ ধ'রে চেষ্টা করলে সেই ফুটো দিয়ে ঝাপসাভাবে ভিতরটা দেখা যায়। আর তখন থেকে আমি নিয়ম ক'রে নিলুম যে কাগজের ছিপি দিয়ে ফুটো বন্ধ না-ক'রে স্নান করতে ঢুকবো না—যদি বা কোনো অসাধু লোক ওত পেতে থাকে আমাকে দেখার জন্য—আমার কোনো মামাতো বা খুড়তুতো ভাই, বা বাবার কোনো ছাত্র যারা সব সময়ে আসা যাওয়া করে—তারপর, সেই নীরন্ধ্র গোপনতায়—স্নানের আগে কিংবা পরে—মাঝে মাঝে আয়নায় দেখতুম নিজেকে—যেদিন ছুটি, তাড়া নেই—আমার সূর্য-চাঁদের উদীয়মান সৌন্দর্য, আমার রোগা, নগ্ন, ভয়-পাওয়া, উল্লসিত শরীর, আমার প্রথম বর্ষার কদমফুল, আমার সরু কাঁধ, ডিমের মতো তলপেট। আমি কোমল হাতে আদর করি তাদের, মনে-মনে বলি, 'তোরা ভালো, তোরা আমার, তোরা আর-একজনেরও। সবুর কর।' কলেজে

যখন উঠলুম তখন আর আমার শরীর নিয়ে লজ্জা নেই, আমি লম্বায় মা-কে ছাড়িয়ে গিয়েছি, আমাকে আর রোগা দেখায় না, লোকেরা বলাবলি করছে আমি দেখতে ভালো।

এক ধরনের সরলভাবে আমি সুখী ছিলুম তখন—মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি ব'লে সুখী, নানা রঙের নানা ফ্যাশনের শাড়ি জামা পরতে পারছি বলে সুখী; মা আমাকে একদিন তাঁর গয়নার বাক্স খুলে খুঁটে-খুঁটে সব দেখালেন—বিছে-হার মটরদানা-হার, হাঁসুলি, জড়োয়া নেকলেস, জড়োয়া কঙ্কন, টায়ারা, আরো কত কিছু যা মা-কে খুব কমই পরতে দেখেছি—আমি মুখে বললুম, 'ওরে বাবা, কী সব জবড়জং, ভাগ্যিশ এখন আর অত গয়না পরার চল নেই!'—কিন্তু মুগ্ধ হলুম এ কথা ভেবে যে একটামাত্র শরীর সাজাতে অত কিছু দরকার হতে পারে, বা দরকার বলে ভাবতে পারে লোকেরা—তারপর কোনো বিয়ে-বাড়িতে বা বন্ধুর জন্মদিনে যেতে হলে মা যখন আমাকে এটা-ওটা পরিয়ে দেন আমি আপত্তি করি না, মনে হয় গয়নাগুলো আমাকে তা-ই করে তুলেছে যা আমি হতে চাচ্ছি, নিজেকে যা মনে-মনে ভাবছি তাই। আরো প্রমাণ পাই ছেলেদের চোখে আর ব্যবহারে, অনেককেই বোকা বা হ্যাংলা বলে মনে হয় আমার, কিন্তু অনিবার্যভাবে কয়েকটা খুচরো ব্যাপার ঘটে গেলো আমার চোদ্দ থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত—একটাতে প্রায় গুটি পেকে আসছিলো কিন্তু ছেলেটা হঠাৎ বিলেত চলে গেলো আর আমিও দু-এক পশলা কান্নার পরে তাকে ভুলে গেলাম। যখন বি. এ. পড়ি কলেজে আমার বেশ একটু খ্যাতি ছড়ালো—'স্মার্ট' মেয়ে বলে, সুশ্রী বুদ্ধিমতী সপ্রতিভ বলে (পড়াশুনোতেও গবেট ছিলুম না), যে-কোন অনুষ্ঠানে সকলের আগে আমার ডাক পড়ে। নয়নাংশু যখন পড়াতে এলো আর আমি দেখলুম ক্লাসের সব ক'টা মেয়ে জিলজিল ক'রে উঠেছে, আমার মনে অচেতনভাবেই একট রেষারেষির ভাব জাগলো—খেলাচ্ছলেই এগিয়ে গিয়ে আলাপ করেছিলুম ওর সঙ্গে, কিন্তু গম্ভীর স্বভাবের নয়নাংশু সেই খেলায় এমন মোড় ফিরিয়ে দিলে যে মাস দু-তিন পরে আমারও মনে হতে লাগলো যে এটা মরণ-বাঁচনের ব্যাপার, আর আমার ভাগ্যে মা-বাবারও মত হতে বেশি দেরি হলো না, যদিও মা-র ঝোঁক ছিলো অন্য এক পাত্রের উপর, তাঁর এক বাল্যসখীর পুত্র, কিছুদূর নাকি কথাবার্তাও গড়িয়েছিলো। আর বিয়ের পরে রাতারাতি যেন অন্য একটা মানুষ জেগে উঠলো আমার মধ্যে, অংশুর মা ও অন্যান্য বয়স্কা আত্মীয়াদের মুখে শোনা 'বৌ' কথাটা যেন একটা জাদুমন্ত্রের মতো—ঐ ছোট্ট বাংলা কথাটার যা-কিছু অর্থ যা-কিছু রস, যা-কিছু সুর, তাই যেন ভ'রে তুলতে লাগলো আমাকে; যেন এতদিন, বাইরের চিকচিকানি সত্ত্বেও, আমি একটা ফাঁপা খোলসমাত্র ছিলুম। ঐ ভাবেই কেটে যেতে পারতো আমার জীবন, যদি না অংশু—যদি না জয়ন্ত—না, আমি—আমিই এটা ঘটিয়েছি।

মনে আছে, জয়ন্ত, তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা? শীতকাল, অংশু আপিশ থেকে ফিরলো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে। ছাইরঙা প্যান্টের উপর টুইডের কোট তার পরনে, পরিষ্কার একটি নেকটাই, আট ঘন্টা আপিশের পরেও পোশাকে বা মুখে যেন পরিশ্রমের ছায়া নেই। আর তুমি—আধ-ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবির উপর বিবর্ণ একটা জহর-কোট, স্যান্ডেলে পায়ে সাত রাজ্যির ধুলো, আর লম্বা কালো বলিষ্ঠ শরীর, চশমার পিছনে চোখ দুটো উজ্জ্বল। আমাকে চা দিতে হলো, বসে থাকতে হলো সেখানে, অংশু যখন স্নান করতে গেলো (শীতকালেও সন্ধেবেলা তার স্নান করা চাই, ভারি ফিটফাট মানুষ) কথা চালাতে হলো তোমার সঙ্গে। এটাই নিয়ম এ-বাড়ির—আমার স্বামীর বন্ধু-বান্ধবদের আমিও বন্ধুর মতো হবো, তাদের আমার ভালো লাগুক আর না-ই লাগুক। বিয়ের ঠিক এক বছর পরে নয়নাংশু কলেজের মাস্টারি ছেড়ে ক্লাইভ স্ট্রীটে এক বিজ্ঞাপনের আপিশে চাকরি নিলো, মাইনে হলো একলাফে আড়াইশো থেকে সাড়ে-চারশো, আর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এলো বেলেঘাটা থেকে এই ঝাউতলা রোডের নতুন তৈরি ঝকঝকে ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটটিকে মনোমতো করে সাজিয়ে নিলে নয়নাংশু (বা তার ইচ্ছে মতো আমি সাজিয়ে নিলুম), তার মতে আমাদের সত্যিকার বিবাহিত জীবন শুরু হলো এবার। ওর বন্ধু-বান্ধব অনেক, প্রায় রোজই সন্ধ্যায়, কেউ-না-কেউ

আসে, রোববার সকালে দেড়টার আগে আড্ডা ভাঙে না, এক-এক রাতে সাড়ে দশটা এগারোটা বেজে যায়। বেলেঘাটায় ওর বন্ধুরা এসে একতলায় বসতো, আমি থাকতুম দোতলায়, আমার শাশুড়ি চা পাঠিয়ে দিতেন চাকরের হাতে, কিংবা ওরা বেরিয়ে গিয়ে বসতো ফেভারিট কেবিনে, বা আড্ডা জমাতো অন্য কারো বাড়িতে। এই ব্যবস্থা আমার মনে হতো স্বাভাবিক ও সংগত, কিন্তু অংশুর আপত্তি ওতে, আমার কাছে তার বন্ধুদের গল্প করে সে, অমুকে ব্রিলিয়েন্ট, তমুকে চমৎকার কথা বলে, আমার সঙ্গে তাদের যে আলাপ হচ্ছে না সেটা একটা আপসোস তার। আমি বলি, 'আমার অত আলাপে-সালাপে কাজ নেই বাপু, বেশ আছি।' সেটা আমার মনের কথাই, আমি অংশুকে নিয়েই ভরপুর তখন, কিন্তু সে আমায় বোঝায় যে পুরুষদের সঙ্গে না-মিশলে বোকা থেকে যায় মেয়েরা, অশিক্ষিত থেকে যায়, নেহাত ঘর-সংসারে আত্মীয় মহলে আটকে থাকলে নাকি মানুষ হিসেবে 'বিকাশ' হয় না মেয়েদের। আলাদা ফ্ল্যাটে এসে অংশু প্রায় জোর করেই আমাকে তার আড্ডায় মেম্বর করে নিলে। বন্ধুরা সস্ত্রীক আসেন খুব কম, কারো-কারো বিয়েও হয়নি—সুন্দর সাজানো ফ্ল্যাট, শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর সংসারের স্বাধীনতা, অঢেল চা, উপরি একজন মহিলার সঙ্গ ও সেবা—এমন বাড়িতে গুলজার করতে কার না ভালো লাগবে? কিন্তু—সেই ঘরভর্তি নতুন-চেনা অল্প-চেনা পুরুষ মানুষের মধ্যে, সুধীন্দ্র দত্তর কবিতা থেকে আফ্রিকার রাজনীতি পর্যন্ত এন্তার অচেনা বিষয়ে তর্কাতর্কির মধ্যে ব'সে থাকতে আমার কেমন লাগতো তা কি নয়নাংশু ভেবেছে কখনো? আমার অস্বস্তি হয়, হাঁফ ধ'রে যায়, চুপ ক'রে থাকতে থাকতে ব্যথা করে চোয়াল, আমার মন-কেমন করে মা-র জন্য, বাবার জন্য, বেলেঘাটার বাড়ির মেয়েলি মজলিশের জন্য, তাছাড়া খুব খারাপ লাগে যেহেতু স্বামীর অবসরের সময় আমি তাকে কখনোই প্রায় একা পাচ্ছি না, আর তা-ই যদি না পেলুম তাহলে যৌথ পরিবার ছেড়ে এসে লাভটা কী হলো? আমি প্রতিবাদ করেছিলুম, 'তোমার বন্ধুদের মধ্যে আমাকে কেন টেনে নিয়ে যাও সব সময়?' 'কেন, তুমি কি পর্দানশিন?' 'পর্দানশিন না-হলেই বেদরকারে বসে থাকতে হবে?' 'বেদরকারে কেন বলছো—এটা তো তোমারও বাড়ি। তাছাড়া সব সময় বসে থাকতে হবে তারও মানে নেই—ভালো না লাগলে উঠে যেয়ো কিন্তু চেহারাটা দেখিয়ো অন্তত।' 'কেন, তোমার স্ত্রী কি-জনে-জনে দেখাবার জিনিশ?' 'কী যে বলো!' ছায়া পড়লো নয়নাংশুর মুখে, 'তুমি না—থাকলে অসম্পূর্ণ লাগে, এই আর কি।' আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'কখনো কি তোমার ইচ্ছে করে না আমার সঙ্গে একা থাকতে?' 'তোমার আমার একা থাকার জন্য সময়ের তো অভাব নেই।' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'তার মানে—তোমার বৌ শুধু তোমার রাতের সামগ্রী?' নয়নাংশু গম্ভীর চোখে তাকিয়ে বললো, 'তুমি একজন ভদ্রমহিলা, মালতী—এ-সব ঠাট্টা তোমার মুখে মানায় না।' একটু পরে আবার বললে, 'তোমার আমার বিয়ে হয়েছে বলে জগতে আর কারো অস্তিত্ব নেই তা তো নয়।'' ঠিক এই যুক্তিটাই ব্যবহার করা যেতো বেলেঘাটার যৌথ পরিবার বিষয়ে, কিন্তু তখন আমার মুখে তা যোগালো না।

নয়নাংশুর সঙ্গে শিক্ষার কোনো তুলনাই হয় না আমার, সে যে কত বিষয়ে কত কিছু জানে তার ইয়ত্তা নেই, এই ধরনের কোনো তর্ক উঠলে শেষ পর্যন্ত আমাকে হার মানতে হয়। কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা অভিযোগ জমে ওঠে—কোনো রোববারেও আমাকে নিয়ে সিনেমায় যায় না কেন নয়নাংশু, শহরে কতকিছু হয় যাতে সবাই যায় তাতে নিয়ে যায় না কেন, ওর ও-সব ভালো লাগে না ব'লে আমি কেন শখ মেটাতে পারবো না? অবশ্য কোনো মহিলা প্রতিবেশী বা বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়ির কাউকে সঙ্গী ক'রে আমি যেতে পারি নানা জায়গায় এবং গিয়েও থাকি—কিন্তু অংশু কেন যাবে না, আশেপাশে সব ভদ্রলোকই স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমায় যান শুধু নয়নাংশুই যাবে না কেন—কেন সবই শুধু তার ইচ্ছেমতো হবে, আমি যদি হিন্দী ফিল্ম ভালোবাসি সে হিন্দী ফিল্মেই যাবে না কেন—নিজের ভালো না লাগলেও আমাকে খুশি করার জন্যই?

আর তাছাড়া, ঐ আড্ডা, যাতে সে ঘন্টার পর ঘন্টা মশগুল হয়ে থাকে—আমার তাতে কী সুখ? আমি অনেক সময় উঠে চলে আসি ওরা বিশেষ লক্ষ্যও করে না, শোবার ঘরে আলো নিবিয়ে শুয়ে থাকি একলা—আমার খিদে পায় ঘুম পায় কান্না পায়, ওদের হাসির শব্দে রাগ হয় আমার, ওদের সিগারেটের গন্ধে মাথা ধরে—রাত বাড়ে ওরা ওঠার নাম করে না, বাড়িটা যেন বাড়ি নয় হোটেল, আর সেই হোটেল চালানোই আমার কাজ। কিন্তু তখন অবশ্য এই অভিযোগের কোন স্পষ্ট চেহারা ফোটেনি আমার মনে, তখন আমি এই সুখে মজে আছি যে অংশু আমাকে 'পাগলের মতো' ভালোবাসে (পরে বুঝেছিলাম সেই ভালোবাসা কী ভীষণ স্বার্থপর—আমি এক রাত মায়ের কাছে থাকতে চাইলে ওর মুখ ভারি হয়, কখনো দু-দিনের জন্য আমায় পিসিমার কাছে আসানসোলে বেড়াতে যেতে চাইলে ও নানারকম ছুতো করে বাধা দেয়; অথচ ও-সব জায়গায় আমার সঙ্গী হতেও রাজী নয় সে; অর্থাৎ ওর যা এতটুকুও অপছন্দ, তা আমার ভালো লাগে বলে ও কখনোই করবে না, অথচ আশা করবে যে যা-কিছু ওর প্রিয় তা আমারও প্রিয় হবে; আমাকেই হতে হবে সারাটা পথ উজিয়ে ওর মনোমতো, কিন্তু ও কোনো ত্যাগ করবে না আমার জন্যে—ওর 'ভালোবাসা'র অর্থ হলো এই, কিন্তু তখন তা বুঝিনি)—তখনও আমার বিবাহিত জীবন এমন মসৃণ, স্বচ্ছন্দভাবে চলেছে যা আমি টের পাচ্ছি না মাস আর বছরগুলির উড়ে চলা। 'শীত পড়লো, এবার পর্দার রং বদলাও', 'কুশানের ঢাকনাগুলো ময়লা হয়েছে', 'আমার পাঞ্জাবিগুলো ছিঁড়ে আসছে এবার—' এই ধরনের ফরমাশ ছাড়ে নয়নাংশু আর আমি ছুটি দোকানে-দোকানে, ওর সব দাবি মিটিয়ে চলি, কিন্তু ও কখনো একখানা শাড়ি হাতে করে নিয়ে আসে না আমার জন্য, কখনো জিগেসও করে না আমার কিছু দরকার কিনা—ও আপিশ করে, তাছাড়া আর-কিছুই করে না সংসারের জন্য, ওর জামা-কাপড়ের দোকানে ঢুকতে 'বমি পায়', পর্দার রং পছন্দ করার জন্য এক ঘন্টা সময় 'নষ্ট করতে' ও রাজী নয়, কিন্তু রংটা ঠিক চোখে না ধরলে খুঁতখুঁতানি ওরই বেশি—এই সবই আমি স্নেহের চোখে দেখছি তখনও, ধ'রে নিচ্ছি যে এটাই ওর পক্ষে ঠিক, এরকম না-হলেই ওকে মানাতো না। ও যে আমাকে সব সময় কাছে পেতে চায়, সেটা একটা গর্বের বিষয় আমার পক্ষে; মাঝে-মাঝে দুপুরে খাওয়ার পরে মা-র কাছে চ'লে যাই (তাঁরা থাকেন বালিগঞ্জ প্লেসে, ঝাউতলা রোড থেকে দূরে নয়), কিন্তু বিকেল হ'তেই পড়ি-মরি ফিরে আসি অংশুর আগে বাড়ি পৌঁছবার জন্য—আপিশ থেকে ফিরে আমাকে না দেখলে খুব খারাপ লাগে ওর—সেটা স্বাভাবিক—কিন্তু কখনো যদি বলি আপিশ থেকে বালিগঞ্জ প্লেসে চ'লে যেয়ো, সেখানেই চা খেয়ে চ'লে আসবো দু-জনে একসঙ্গে, তাতে ও রাজী নয় কখনো, মার কাছে আরো কিছুক্ষণ থাকতে যতই ইচ্ছে হোক আমার—ও চায় ওর নিজের বাড়ির অভ্যস্ত আবহাওয়া অভ্যস্ত আরাম, চায় ওর নিজের নিজত্ব, যার একটা অংশ হলাম আমি—আর আমার সেই ভূমিকাই আমি সানন্দে মেনে নিয়েছি তখন। ওর সান্ধ্য আড্ডাতেও আমি না-থাকলে ওর যে 'সম্পূর্ণ' লাগে না এতে আমার কখনো-কখনো কষ্ট হ'লেও সেই কষ্ট ছাপিয়ে অনেক বড়ো হ'য়ে উঠেছে এই গর্ব আর আনন্দে মেশানো অনুভূতি যে আমি নয়নাংশুর পক্ষে কত প্রয়োজন, কত মূল্যবান। আর ধীরে ধীরে আমার নিজেরই অজান্তে, একটা পরিবর্তন হ'লো আমার জীবনে নয়নাংশু দলবলের সঙ্গে মেলামেশায় আমি পুরোপুরি অভ্যস্ত হ'য়ে গেলুম, শিখে নিলুম ওদের কথাবার্তায় যোগ দেবার কায়দাটা, লক্ষ্য করলুম আমার কথাগুলো নেহাত বোকার মতো হয় না, ওদের কাছে বাহবাও পাই মাঝে-মাঝে! শুধু তা-ই নয়, আমার মনে হ'তে লাগলো ওদের মধ্যে কেউ-কেউ শুধু নয়নাংশুর কাছেই আসছে না আজ-কাল, আমারও কাছে আসছে, আমি ওদের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা মর্যাদা পাচ্ছি—শুধু বন্ধুর স্ত্রী বলে নয়, আমার নিজেরই জন্য! আমার ভালো লাগলো সেটা—মনে হ'লো অংশু যেমন চেয়েছিলো তেমনি ভাবেই আমি হ'য়ে উঠেছি আলাদা একজন মানুষ—ব্যক্তি—আর অংশুও সুখী হয়েছে আমি যে তার বন্ধুদের মধ্যে নিজের একটি জায়গা ক'রে নিতে পেরেছি। ওর

কোনো-কোনো ধারণা আর ব্যবহার আমার একটু অদ্ভুত লাগছে তখনও, কেমন বাড়াবাড়ি মনে হয়—যেমন একদিন বীরেন তালুকদারের বাড়িতে রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিলো আমাদের, ফেরার সময় বীরেনবাবুই আমাদের পৌঁছিয়ে দিলেন তাঁর গাড়িতে, তাঁকে নিয়ে ছ-জন ছিলুম আমরা—কী ভাবে বসা হবে সেটা স্থির করতে একটু সময় লাগলো। অংশু আমাকে বললো বীরেনবাবুর পাশে বসতে, আমার ইচ্ছে ছিলো না কিন্তু বেশি আপত্তি করতে লজ্জা করলো, আমার পাশে বসলো একটি মোটাসোটা চোদ্দ বছরের মেয়ে—ঘেঁষাঘেষিতে অস্বস্তি লাগছে আমার, পিঠ খাড়া ক'রে ব'সে আছি, বীরেনবাবু আমাকে বার-বার বলছেন আপনি ভালো হ'য়ে বসুন, মিসেস মুখার্জি, আমার চালাতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, আর আমি বার-বার বলছি আমি বেশ আছি। বাড়ি এসে অংশুকে বললুম, 'তুমি তখন আমাকে বললে কেন বীরেনবাবুর পাশে বসতে?' 'তাতে কী হয়েছে?' 'বড্ড ঘেঁষাঘেঁষি হচ্ছিলো।' 'আমাদেরও তা-ই।' 'কিন্তু' কীভাবে কথাটা বলা যায় ভাবছিলুম, কিন্তু নয়নাংশু তা বুঝে নিয়ে বললো, 'তুমি কি এমন সাংঘাতিক সতী যে গাড়িতেও স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের পাশে বসবে না? আমার তো মত অন্যেরা থাকলে স্বামী-স্ত্রীরই কখনো পাশাপাশি বসা উচিত নয়।'—শোন কথা, কী-রকম সব সৃষ্টি ছাড়া ধারণা! আর-একদিন অংশু আপিশের কাজের জন্য তৈরি হচ্ছে ঠিক তক্ষুণি ওর এক পুরোনো বন্ধু এসে উপস্থিত, তার সঙ্গে কয়েকটার বেশি কথা বলার সময় পেলো না অংশু, ব্রিফকেস গোছাতে-গোছাতে বললো, 'তুমি এক্ষুণি যেয়ো না, অসিত—বোসো, চা খাও।' অসিতবাবু বিব্রত হ'য়ে বললেন, 'আমি ভেবেছিলুম তোমারও আজ রথের ছুটি—তা আমি না-হয় সন্ধের দিকে আবার আসবো, এখন চলি।' 'আরে একটু বোসো না—অত দূর থেকে এলে, এক্ষুণি চলে যাবে কী।' ভদ্রলোক বসে গেলেন, আমি তাঁকে চা-বিস্কুট খাওয়ালুম, কথা বলতে-বলতে সাড়ে-দশটা বাজিয়ে দিলেন তিনি। রাত্রে আমি নয়নাংশুকে বললুম, 'তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? অসিতবাবুকে তখন বসতে বলেছিলে কেন?' নয়নাংশু বললে, 'বাঃ, মফস্বলে থাকে, কতকাল পরে এসেছে—তক্ষুণি ফিরে যাবে তা কি হয়?' 'তুমি বাড়ি না-থাকলে কী হতো?' 'আমি না-থাকলে তুমি ওকে আপ্যায়ন করতে, তোমারও তো অচেনা নয় অসিত।' 'আমি যে একা বাড়িতে, বুন্নিও স্কুলে ছিলো তখন।' 'তাতে কী হয়েছে।' আমার দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে রইলো নয়নাংশু, একটু পরে আবার বললো, 'অসিত না হয়ে যদি হতো কোনো সুপ্রভা কি তপতী তাহলে কী করতে?' 'সে আলাদা কথা।' 'আলাদা কেন? মেয়ে-পুরুষের তফাতটা কি কখনোই ভুলতে পারবে না তুমি?' আমি মনে মনে বললুম, 'তা কি ভোলা যায়?'

শুধু সেদিনই নয়—অনেক অনেকদিন এমন হয়েছে যে অংশু বাড়ি নেই আর আমি তার কোনো বন্ধুকে আপ্যায়ন করছি—গৃহকর্ত্রী হিসেবে সেটাই আমার কর্তব্য হয়তো, কিন্তু এই কর্তব্য-যা শুরুতে আমি দায়ে পড়ে মেনে নিয়েছিলুম—তা ক্রমশ দেখলুম, আমার বেশ ভালো লাগছে। আমার যে-সব কথা নয়নাংশু আর মন দিয়ে শোনে না (কেননা তা পুরানো হয়ে গেছে তার কাছে), সেগুলো ভালো লাগে অন্যদের; আমি যদি কোনো ঘটনার বিবৃতি দিই তাহলে অংশু প্রায় সব সময়ই বলে ওঠে, 'তুমি ঠিক বলছো না, এটা এরকম হয়নি, ওরকম হয়েছিলো—' কিন্তু অন্যেরা উপভোগ করে সেটা, আর অংশু কাছে না থাকলে আমারও বলার স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যায় আর বন্ধুরাও যেন একটু বেশি মন খুলে কথা বলে তখন। অবশেষে এমনও হলো যে অংশ উপস্থিত থাকলেও কেউ-কেউ আমার দিকেই বেশি মনোযোগ দেয়, সেটা কিন্তু ভালো লাগেনা তার—যদিও সে আমাকে এতদিন ধরে স্ত্রী-পুরুষের সাম্যের মন্ত্র জপিয়েছে।

নয়নাংশুর বন্ধু বান্ধব নানা ধরনের—কেউ কেউ তার ছাত্রবয়সের পুরোনো, কারো-কারো সঙ্গে বিজ্ঞাপনের সূত্রে তার আলাপ, কেউ বা সাংবাদিক বা সাহিত্যিক গোছের। কাউকে অল্প একটু ভালো লাগলেই বাড়ি আসতে বলা তার বরাবরকার অভ্যেস, আর-একটা অভ্যেস যে-কোন নতুন

আগন্তুকের আগে-ভাগে অত্যন্ত বেশি প্রশংসা করা। যাদের সে অপছন্দ করে তাদের যেমন 'লাউট্' কিংবা 'স্কাম্' বলতে তার বাধে না, তেমনি কারো মধ্যে একটুখানি ভালো দেখতে পেলে তাকে সে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আকাশে তোলে। ব্যোমকেশ ভাদুড়ীর বিষয়ে সে বলেছিলো, 'অতি সজ্জন-কালচার্ড-ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন মানুষ বড়ো দেখা যায় না—' আর কিছুদিন পরে কী-একটা রাজনৈতিক কারণে ব্যোমকেশবাবুর যখন জেল হলো তখনও নয়নাংশু বললো যে ও-রকম একজন চমৎকার ভদ্রলোককে ধরে জেলে পাঠানো অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু হঠাৎ একদিন যখন আলিপুর জেলের ছাপ-মারা মোট চিঠি এলো আমার নামে তখন আমি তার মুখে ছায়া দেখলুম। আমি তাকে পড়তে দিলুম চিঠিটা—সম্পূর্ণ 'নির্দোষ' চিঠি-আমাদের এখানে এসে তাঁর কত ভালো লেগেছিলো, আর সব প্রিয় পরিবেশ থেকে বিছিন্ন হয়ে এখন অনেক ছোটো জিনিশকেও মূল্য দিতে শিখেছেন—পড়তে বেশ লাগলো আমার, একটু কষ্টও হলো ব্যোমকেশবাবুর জন্য, কিন্তু নয়নাংশু পড়ে শুকনো গলায় শুধু বললে, 'বেশ বাংলা লেখেন ভদ্রলোক।' অথচ—আমি জানি—চিঠিটা যদি আমার বদলে তাকে লেখা হতো, তাহলে ওটার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো সে, খেতে বসে সারাক্ষণ আমাকে ব্যোমকেশ ভাদুড়ীর গুণগান শুনতে হতো। আর-একবার—আমাদের নিমন্ত্রণ ছিলো লেকের রঞ্জনী ক্লাবে, সাহিত্যিক গুণময় দেব নয়নাংশুকে দেখেই বলে উঠলেন, 'মালতী দেবী কোথায়?' পরমুহূর্তে আমাকে দেখতে পেয়ে হেসে বললেন, 'আসুন মিসেস মুখার্জি, আপনাকে ছাড়া আপনার স্বামীকে সম্পূর্ণ মনে হয় না।'—সেদিন আবার সেই ছায়া দেখলুম নয়নাংশুর মুখে; বাড়ি ফিরে বললে, 'গুণময়বাবু ভারি সরল মানুষ, মনের সব কথাই মুখে বলে ফ্যালেন।' আমি একটু চতুরভাবে বললুম, 'আমার কিন্তু গর্ব হতো যদি কেউ বলতো তোমাকে ছাড়া আমি অসম্পূর্ণ।' 'কোনোটাই ঠিক নয়—মানুষের যদি কোনো মূল্য থাকে সে তার নিজেরই মধ্যে—আমরা অমুকের স্বামী অথবা স্ত্রী, এ ছাড়াও আমাদের পরিচয় আছে। ও-রকম ক'রে বলাটা অভদ্রতা—এবং বোকামি।' আমি তর্ক তুললুম, 'তাহ'লে আমি কেন তোমার মিসেস বলেই নানা জায়গায় নিমন্ত্রণে যবো?' 'ইচ্ছে না-হলে যেয়ো না।' আর কথা বললো না নয়নাংশু, বিছানায় এসে পাশ ফিরে গুম হ'য়ে রইলো, যেন আমিই কোনো অপরাধ করেছি। আমিও মুখ ফিরিয়ে রইলুম, আমার মনে পড়লো সে-ই একদিন বলেছিলো, আমি না থাকলে তার আড্ডা 'অসম্পূর্ণ', আজ যদি ও-রকম কথাই অন্য কেউ ব'লে থাকে এমন কী দোষ করেছে? কেন অমন মেজাজ খারাপ হ'লো নয়নাংশুর? অথচ গুণময় দেবের লেখার প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ-ওঁর নতুন উপন্যাস নিয়ে এক ঘন্টা ধ'রে কথা বলতেও তাকে শুনেছি। আসলে গুণময় দেব ওর চাইতে আমার প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন, আমি না গেলে অত্যন্ত নিরাশ হতেন উনি, আমাকে দেখামাত্র ওঁর মুখে-চোখে খুশি ফুটে উঠলো, এই ব্যাপারটা নয়নাংশু তার একজন প্রিয় লেখকের মধ্যেও ক্ষমা করতে পারচে না। কিন্তু কেন এটা অন্যায়? কেন অভদ্রতা? রঞ্জনী ক্লাবে আমরা দু'জনেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম, সেই দু'জনের যে-কোন একজন অনুপস্থিত থাকলে সেটা লক্ষণীয় হবে—এ তো সোজা কথা। আর-'আপনাকে ছাড়া আপনার স্বামীকে সম্পূর্ণ মনে হয় না—' এই কথাটায় আসলে তো কম্প্লিমেন্ট দেয়া হচ্ছে আমাদের দু'জনকেই, একটি সুখী দম্পতিরূপে দেখা হচ্ছে আমাদের—তা-ই নয় কি? আমাদের বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন গুণময়বাবু, অন্যান্য জায়গাতেও দেখা হয়েছে, সর্বদা একসঙ্গে দেখেছেন অংশুকে আর আমাকে, সেইজন্যেও ও-রকম কথা তাঁর মনে হওয়া স্বাভাবিক—তাই নয় কি? কী দোষ আছে এতে? অংশু এতো রেগে গেলো কেন? আমি যখন ওর আপিশ সংক্রান্ত কোনো অনুষ্ঠানে বা নিমন্ত্রণে যাই মিস্টারের সঙ্গে মিসেসরূপী লেজুড় হ'য়ে, যেখানে স্ত্রী ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই আমার—সেটা তো সে দিব্যি মেনে নেয়। আসল কথা—স্বামী মশাই যে কর্তা তা ভুলতে পারে না, স্ত্রী যে অধীন তা ভুলতে পারে না; আসল কথা—যতই আমরা আধুনিকতার বড়াই করি—পুরুষের পুতুল হ'য়ে থাকতে হবে

মেয়েদের। অথচ মুখে কতই না গালভরা বুলি নয়নাংশুর। কিন্তু ওর মনের তলার কথাটা কি এই নয় যে সকলেই সব সময় আমার চাইতে ওর দিকেই বেশি মনোযোগ দেবে? আর তার মানে কি এই দাঁড়ায় না যে ও-ই স্বার্থপর, আত্মম্ভরি, হিংসুক? ভাবতে-ভাবতে আমার মাথার মধ্যে চিড়বিড় ক'রে উঠলো, ওর পাশে শুয়ে থাকতে বিশ্রী লাগলো সেই রাত্রে।

জয়ন্তকে নিয়েও সেই একই ব্যাপার-অংশু যেদিন প্রথম তাকে নিয়ে এলো সে চলে যাবার পর তার অনেক প্রশংসা শুনতে হ'লো আমাকে। 'ইনি টাকার অভাবে কলেজের পড়া শেষ করতে পারেননি, কয়েকবছর ডেটিন্যু ছিলেন, বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিও চালিয়েছেন কলকাতায়—তেমন উচ্চশিক্ষিত এঁকে বলা যায় না হয়তো, কিন্তু যাকে বলে কর্মবীর ইনি তা-ই।' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কী রকম?' উত্তরে শুনলুম ইনি পাঁচ বছর আগে প্রায় বিনা মূলধনে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন, এক হাতে খেটে দাঁড় করিয়েছেন সেটাকে, তাইতে কোনোরকমের সংসার চালান—পত্রিকার অর্ধেক উনিই লেখেন, প্রুফ দ্যাখেন, বিজ্ঞাপন যোগাড় করেন ঘুরে-ঘুরে—'ভেবে দ্যাখো, এইভাবে একটা সাপ্তাহিক চালানো কি সোজা কথা!' 'কর্মবীরে'র এই বর্ণনা শুনে একটু হাসি পেলো আমার—' কিন্তু আমি জানি অংশু সহজেই মেতে ওঠে কাউকে বা কোনোকিছুকে নিয়ে, তার উৎসাহের সামনে আমাকে মনের ভাব গোপন করতে হ'লো। 'তোমার কাছে বিজ্ঞাপনের জন্য গিয়েছিলেন বুঝি?' অংশু মাথা নেড়ে জবাব দিলো, 'আমি ভাবছি যতটা পারি করবো ওঁর জন্যে। ওঁর কথাবার্তা শুনে আমার ভালোই লাগলো মোটের উপর।' 'কেমন দুমদাম কথা বলেন ভদ্রলোক!' যেন তার এই নতুন 'আবিষ্কারে'র কোনো নিন্দে করা হচ্ছে, এমনি সুরে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলো অংশু-'হ্যাঁ, ওঁর-বাইরেটা তেমন মোলায়েম নয়, কিন্তু ভিতরে পদার্থ আছে।' সেই থেকে শুরু হ'লো আমাদের বাড়িতে জয়ন্তর আনাগোনা, নয়নাংশুই তাকে বহাল করলে।

কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেলো জয়ন্ত অংশুর চাইতে আমারই দিকে অনেক বেশি মনোযোগী। এটাকে গোপন করার কিছুমাত্র চেষ্টা করলো না সে, কোনো ছলছুতোর সাহায্য নিলে না—প্রতিটি ব্যাপারে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে যে সে আমারই জন্য এ-বাড়িতে রোজ হাজিরা দেয়। মাঝে-মাঝে সে সকাল বেলাতেও চ'লে আসে, ঠিক যখন নয়নাংশুর আপিশে বেরোবার সময়—আরাম ক'রে সোফায় পিঠ এলিয়ে বলে, 'আচ্ছা মিস্টার মুখার্জি, আপনি তাহ'লে আপিশ ক'রে আসুন—আমার তো চাকরি-বাকরি নেই, আমি একটু শ্রীমতীর সঙ্গে গল্প করি।' একজন সদ্যচেনা পুরুষের কাছে এ-রকম ব্যবহার কোনো বিবাহিতা মহিলার ভালো লাগার কথা নয়, কিন্তু আমি যে বারো বছর ধ'রে অংশুর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি তার তো কিছু ফলাফল আছে, তাছাড়া অংশু কোনো আপত্তি না-করলে আমার মাথা-ব্যথা কিসের, আর আমি জয়ন্তর সঙ্গে কোনো রূঢ় আচরণ করলে অংশুই যে আমার উপর রেগে যাবে না তা-ই বা আমি কেমন ক'রে জানবো?

একদিন-জয়ন্ত প্রথম আসার মাসখানেক পরে, আমি অংশুকে বললুম, 'তোমার এই নতুন বন্ধুকে নিয়ে তো মুশকিল হ'লো।' অংশু বুঝেও বললো, 'কার কথা বলছো?' 'জয়ন্তবাবু মাঝে-মাঝে সকালে এসে ব'সে থাকেন—এদিকে আমার কত কাজ থাকে সংসারে, বুন্নি স্কুল থেকে ফেরে, রাঙাদি আসেন, তোমার চারুমামা এসেছিলেন আজ—আর এইটুকু বাড়ি, আমার অসুবিধে হয়।' 'ত তুমি যদি ওঁর দিকে মন না দাও তাহ'লে হয়তো সকালে আসা ছেড়ে দেবেন।' 'আমি আবার আলাদা ক'রে মন দেবো কী? একটা মানুষ ব'সে থাকলে এমন তো আর ভান করা যায় না যে মানুষটা সেখানে নেই।' 'উনি যদি নিজে না বোঝেন তোমার অসুবিধে হচ্ছে তাহ'লে বুঝিয়ে দিতে হবে।' আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'তুমি একবার কথা বলবে নাকি ওঁর সঙ্গে?'

'উনি তো আমার কাছে আসেন না, আমি কেন কথা বলতে যাবো?' ব'লে অংশু একটা বই খুলে বসলো।

—না, কেন আর মিথ্যে মিছিমিছি, এখন আর কোনো ভয় নেই আমার। বলো, মালতী, সত্য বলো, তোমার কি 'অসুবিধে' হ'তো জয়ন্তর জন্য, না কি সেই সব আত্মীয়ের জন্য, যারা মাঝে-মাঝে এসে ব্যাঘাত ঘটাতো তোমাদের আলাপে? আর ঐ যে তোমার স্বামীকে বলেছিলে, 'উনি এসে ব'সে থাকেন—' তার মানে তুমি যেন কিছু জানো না, যেন তোমার কোনো দায়িত্ব নেই, আড়ে-ঠারে যাচাই ক'রে নিলে অংশুকে, দেখে নিলে তার মনের গতিটা কোনদিকে—এই তো? পাছে তোমার স্বামী রেগে যান, পাছে তাঁর 'শিক্ষা'র তুমি অসম্মান করো, তুমি কি তা-ই ভেবে ব'সে থাকতে জয়ন্তর কাছে, জয়ন্তর মুখোমুখি, ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনে রাত্রে প্রায় যে-কোনো সময়ে? তার সাড়া পেলে তোমার অতি প্রিয় বিকেলের ঘুম ছেড়ে তখুনি উঠে পড়ো তুমি, সে যদি রাত্তির একটা অবধিও কাটিয়ে যায় কক্ষনো তোমার ঘুম পায় না, পাছে কোনো অসময়ে এসে সে ফিরে যায় সেই ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোনো প্রায় ছেড়েই দিয়েছো—এ সবের অর্থ কে না বোঝে মালতী? অন্য কাউকে টেনে এনো না এর মধ্যে—বলো, কেউ শুনছে না, এই গভীর রাত্রে, বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে-মিশিয়ে বলো যে তুমি প্রায় প্রথম দিন থেকেই নিজেকে তুলে দিয়েছিলে জয়ন্তর হাতে—তোমার যে অংশটিকে নয়নাংশু কখনো ছুঁতে পারেনি, সেখানে তুমি রক্তে মাংসে টকটকে রঙে একই সঙ্গে দাসী আর রানী হ'তে চাও, সেইখানাটায় জয়ন্ত এসে নাড়া দিলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে উথলে উঠলো তোমার সমস্ত যৌবন আর নারীত্ব।

—কিন্তু নয়নাংশু কেন আপত্তি করেনি? কেন কিছু বলেনি কখনো? বলেনি তা নয়, তোমাকে সতর্ক ক'রেও দিয়েছিলো সে।—ঈর্ষা, বিশুদ্ধ ঈর্ষা। আমাকে আলাদা ক'রে কেউ মূল্য দেবে, এটা নয়নাংশুর সহ্য হয় না। একদিন বললো, 'আমার মনে হয় জয়ন্তবাবু তোমার প্রেমে পড়েছেন।' আমি ভুরু কুঁচকে বললুম, 'সে আবার কী?' 'আমি তাঁকে দোষ দিচ্ছি না, তাঁর পারিবারিক জীবন সুখের নয়, কিন্তু এর পরিণাম কী হবে বা হবে না তা তোমারই উপর নির্ভর করছে।' ওর এই পাদ্রিসাহেবের মতো কথা অসহ্য লাগে আমার, ঝাঁঝিয়ে উঠে বললুম, 'তুমি কী বলতে চাচ্ছো শুনি?' 'যা বলতে চাচ্ছি তা একজন ভদ্রলোকের পক্ষে বলা খুব শক্ত-নিজে বুঝে নিয়ো।' আমি ক্ষিপ্ত হ'য়ে বললুম 'নিজেকে তুমি ভদ্রলোক বলো—তোমার লজ্জা করে না নিজের স্ত্রীকে কুৎসিত ইঙ্গিত ক'রে কথা বলতে! জয়ন্তবাবু তোমারই বন্ধু, আমার নন। তুমিই ওঁকে আসতে বলো বার-বার—আমি বলি না! ওঁকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিলেই পারো!' 'ওঁকে বের ক'রে দিলে তুমি সুখী হবে?' 'আমি সুখী হই বা না হই তাতে তোমার কী এসে যায়?' 'তার মানে-সুখী হবে না?' 'এত রাত্রে আর ইতরের মত চ্যাঁচামেচি কোরো না—আমাকে ঘুমুতে দাও।' রাগে গা কাঁপছিলো আমার, নয়নাংশুকে বিষের মতো লাগছিলো। পরের দিন আমি সন্ধে থেকে শোবার ঘরে লুকিয়ে রইলুম, টের পেলুম বসার ঘরে লোকজন আসছে-একটু পরে জয়ন্তর গলা পেলুম, 'শ্রীমতী কোথায়? তাঁকে দেখছি না?' নয়নাংশু কী জবাব দিলে শুনতে পেলুম না, কিন্তু হঠাৎ দেখি পর্দা ঠেলে শোবার ঘরে এসে ঢুকছে জয়ন্ত! 'একী! শুয়ে যে?' আমার মুখ দিয়ে একটা মিথ্যে বেরিয়ে গেলো-'মাথা ধরেছে।' 'মাথা ধরেছে? জ্বর হয়নি তো?' ব'লে জয়ন্ত আমার কপালের উপর হাত রাখলো—থাবার মতো মস্ত তার হাতটা। আমি তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বললুম 'চলুন ও ঘরে।' 'কেন, এই তো বেশ।' অংশুর লেখার চেয়ারটা খাটের কাছে এনে গল্প জুড়ে দিলো আমার সঙ্গে।

এইজন্যেই আমি ভালোবাসি তোমাকে, তুমি মিনিমুখো নও, ভীরু নও, সাবধানী পর্যন্ত নও—হাতের সব তাস টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে খেলছো তুমি, আর সেইজন্যেই কেউ তোমাকে ঠেকাতে পারছে না, পারবেও না। আমার আলো, আমার রোদ, আমার জয়ন্ত। কেমন করে তুমি

জেনেছিলে নয়নাংশুর কাছে কী-কী আমি পাইনি, কিসের অভাবে ভিতরে-ভিতরে আমি শুকিয়ে যাচ্ছিলাম। নয়নাংশু চেয়েছে নিছক তার যুবতী স্ত্রীটিকেই, নিজের সুখের জন্য আরামের জন্য, আমার মনের দিকে তাকায়নি কখনো, আমার পারিপার্শ্বিক আত্মীয়-স্বজন বিষয়ে উৎসাহ নেই তার—কিন্তু জয়ন্ত তুমি জানতে চেয়েছো আমার ছেলেবেলার কথা, আমর মা-বাবা ভাইবোনদের কথা, আমার বাপের বাড়ির পুরোনো চাকর গঙ্গার গল্পও মন দিয়ে শুনছো। নয়নাংশুর যেন আমার বিষয়ে একটা স্নেহ মেশানো মাস্টারি ভাব—আমাকে সে অন্য কিছু করে নিতে চায়—কিন্তু আমি নিজে যা, আমি যা কিছু করি আর বলি, তাই তোমাকে আনন্দ দেয় জয়ন্ত। কত কথা আমি বলেছি তোমাকে, বলতে পেরে খুশি হয়েছি—নেহাত ঘরোয়া সাধারণ কথা, মেয়েলি কথা, যা নয়নাংশুকে কখনো বলা হয়নি সে শুনতে চায়নি বলেই। একদিন তুমি আমাকে জিগেস করলে, 'আপনার কোনো ডাকনাম নেই?' 'আছে একটা।' 'কী, শুনি?' 'লোটন। আমার বাপের বাড়িতে আমার ঐ নাম।' একটু পরেই তোমার জীবনের একটা ঘটনা আমাকে শোনালে তুমি—লোটন নামে একটি নায়িকার আমদানি করলে, আমি বুঝতে পারছিলুম গল্পটা তুমি তখন-তখন মুখে-মুখে তৈরি করছো, শুধু লোটন নামটা বার-বার উচ্চারণ করার সুখের জন্য। অথচ নয়নাংশু আমাকে সভ্যভব্য মালতী ব'লেই ডাকে, আদরের সময় নিজে অনেক কিছু বানিয়ে নেয় কিন্তু লোটন বলে ডাকে না; তার মতে ওটা নাকি মানায় না আমাকে, ওটা 'ন্যাকা' নাম, অর্থাৎ আমার বিয়ের আগেকার কুড়ি বছরের জীবনটাকে সে উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু তুমি নিলে আমার জীবনের অংশ, আমার অতীতের আর বর্তমানের, আমার কথা শুনে-শুনে ক্লান্তি নেই তোমার; আমি বুঝতে পারলুম তোমার জীবন এখন আমাকে ঘিরে-ঘিরে ঘুরছে, সেটা তুমি খুব সরলভাবে সহজভাবে মেনে নিয়েছো, তা নিয়ে কোনো ভয় নেই তোমার, লজ্জা নেই—কত সহজে আমার হাত ধরেছিলে তুমি, কানে কানে 'লোটন' বলে ডেকেছিলে, আড়ালে যখন 'তুমি' বলো মনে হয় যেন চিরকাল আমি তা-ই শুনেছি, আর তাই তো যেদিন প্রথম আমাকে জাপটে ধরে চুমু খেলে আমি অবাক হলাম না, ভাবলাম না এটা ভালো হলো না মন্দ হলো, শুধু সারা শরীরে থরথর করে কেঁপে উঠলাম যেন আমি ষোলো বছরের কুমারী।

কবে, কতদিন কেমন করে ঐ অবস্থায় আমরা পৌঁছেছিলাম? একদিন, রাত প্রায় দশটা, আমাদের বসার ঘরের আড্ডা তখনও ভাঙেনি, তিব্বত, চীন, আর নেহরুকে নিয়ে কথা বলছে অংশু আর তার দু-জন বন্ধু, অংশু বলছে এই একটা বিরাট ভুল করলেন জহরলাল—এমন সময় দরজায় টুকটুক টোকা পড়লো। আমি সন্ধে থেকে উশখুশ করছিলাম, ছটফট করছিলাম মনে মনে—সকলের আগে উঠে গেলাম ফ্ল্যাটের দরজায়। দরজাটা আধখানা খোলা ছিলো, আমি কাছে গিয়েই দেখতে পেলাম শাদা-কালো লম্বা একটা ছায়ার মতো মানুষ; তক্ষুণি—কিংবা তার অনেক আগেই একটুখানি অংশ মাত্র দেখেই, শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটুকু থেকেই, চিনতে পারলাম সেই তাকে, যে আসেনি ব'লে সব আমার ফাঁকা লাগছে। সেদিন সকালেও আসেনি জয়ন্ত, সারাদিনের মধ্যে একবার আসেনি—কত মাসের মধ্যেও এ-রকম দিন একটাও কাটেনি, সন্ধে যত এগিয়ে যাচ্ছে তত আমি উৎকণ্ঠায় এলিয়ে পড়ছি—বুন্নিকে খাওয়াবার জন্য মাঝে একবার উঠে গিয়েছিলাম, শুয়েছিলাম বুন্নির পাশে অন্ধকারে, একটি চেনা গলার আওয়াজের জন্য কান দুটোকে পাহারায় রেখে—বুন্নি ঘুমিয়ে পড়ার পর আবার এসে চেষ্টা করেছিলাম অংশুদের কথাবার্তা শুনতে, আমার অবাক লাগছিলো, যে চীন তিব্বত ইত্যাদি দেশ, যা ম্যাপে ছাড়া আমরা কখনো দেখবো না, তা নিয়ে এত উত্তেজনার সৃষ্টি হ'তে পারে ঝাউতলা রোডে কলকাতায়। আজ কি ট্রাম-বাস সব বন্ধ? ট্যাক্সি অচল? অসুখ? অন্য কোনো বিপদ? কিন্তু এমন কি কোনো কথা আছে যে রোজই তাকে আসতে হয়? তা যদি না-ই থাকবে তাহ'লে এতদিন ধ'রে আমাকে জ্বালিয়েছে কেন, আমার সময় নষ্ট করেছে কেন, কেন অশান্তি ঘটিয়েছে অংশুর আর আমার মধ্যে, কেন এসেছিলো

তিন মাইল রাস্তা জল-কাদা উজিয়ে বুন্নির জন্মদিনে? এ-সব কি ছেলেখেলা হচ্ছে—তার খেয়ালমতো আসবে কিংবা আসবে না? মনে রাখে যেন, আমাদের কোনো দরকার নেই তাকে দিয়ে, আমরা তাকে যে-কোনো মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পারি—আমি একজন সুখী, বিবাহিত ভদ্রমহিলা, স্বামী আছে সন্তান আছে, মা-বাবা আত্মীয়স্বজন সবাই আছেন, ভরপুর আমার জীবন, আমি থোড়াই পরোয়া করি এক বাজে সাপ্তাহিকের সম্পাদক মশাইকে, মানুষ হিসেবে আমার স্বামীর সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না যার—কিন্তু তারই পক্ষে আশ্রয় হয়েছি আমরা, নেহাতই আমার স্বামী অত্যন্ত ভালো ব'লে ঢুকতে পেরেছে আমাদের বাড়িতে, প্রায় আমাদের বাড়ির একজন হ'তে পেরেছে। এর মূল্য সে যদি না বোঝে তো আমার ভারি ব'য়ে গেলো!

ঠিক এই রাগের মুখেই জয়ন্তর ছায়া দেখলাম দরজায়। দরজা খোলা পেয়েও সে যে টোকা দিয়েছিলো তাতে আমি একটু অবাক হলাম, আরো অবাক হলাম যে আমাকে দেখেও সে ভিতরে এলো না। তাকে পথ দেবার জন্য আমি স'রে দাঁড়ালাম, কিন্তু সে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। সিঁড়ির আলোটা তেমন উজ্জ্বল নয়, তবু আমার মনে হ'লো জয়ন্তকে আজ অন্য রকম দেখাচ্ছে। আমার দিকে তাকালো সে, কিন্তু-যদিও আমি অত কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তবু আমার মুখের উপর দৃষ্টিটাকে আটকে দিতে বেশ একটু সময় লাগলো তার, যেন হঠাৎ কোনো কারণে ভালো দেখতে পাচ্ছে না। তার চোখ একটু লাল মনে হ'লো আমার, আর ঠোঁটে একটা অদ্ভুত হাসি, নীচের ঠোঁটটা যেন বড্ড বেশি ভেজা আর চকচকে, আমি আবার অবাক হলাম সে অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কেন, কেন কিছু কথাও বলছে না। তারপর হঠাৎ সে দু-পা এগিয়ে এলো আমার দিকে, হাত বাড়িয়ে দিলো—কিন্তু তার হাতটা পড়লো গিয়ে দরজার উপর, একেবারে অন্যরকম গলায় জড়িয়ে-জড়িয়ে বললো, 'লোটন! তুমি একা একবার দেখা করবে আমার সঙ্গে? কাল দুটোর সময়—মেট্রো সিনেমার সামনে?' আমি আন্দাজে বুঝলাম সে কী বলছে, আমার বুকের মধ্যে দুরদুর করতে লাগলো, ভেবে পেলাম না এখন আমার কী করা উচিত, হঠাৎ দেখি অংশু এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। অংশু আমার দিকে তাকালো না; গম্ভীর গলায় বললো, 'জয়ন্তবাবু, আপনি আসুন আমার সঙ্গে-' বলে তাকে হাতে ধরে নামাতে লাগলে সিঁড়ি দিয়ে। জয়ন্ত একটু বাধা দিলে প্রথমে, 'লোটন' 'লোটন' বলে ডেকে উঠলো আরো কয়েকবার, আমি সেখানে আর না-দাঁড়িয়ে শোবার ঘরে চলে এলাম। সেই একবার মনে-মনে বলেছিলাম, জয়ন্তর বন্ধুরা যেন আরো অনেকক্ষণ কাটিয়ে যায়, কিন্তু মিনিট দশেক পরে অংশুর ফিরে আসার আওয়াজ শুনলাম কিন্তু মনে হলো তিব্বত-চীনে কারোরই আর উৎসাহ নেই, বাড়ি নিঃশব্দ হতে দেরি হলো না।

নিঃশব্দে আমরা খেয়ে উঠলাম সে রাতে, খাওয়ার পরে অংশু আমাকে কিছু কথা বললো। আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম মনে-মনে, প্রায় কান্না পাচ্ছিলো, ব্যাপারটা কি ঘটে গেলো তা ঠিকমতো বুঝিনি তখনও, কিন্তু ঝাপসাভাবে মনে হয়েছিলো এর জন্য আমাকে শাস্তি পেতে হবে। অংশু আমাকে বুকে টেনে নিয়ে শান্ত করতে পারতো, তার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে পারলে আমার মন হালকা হ'য়ে যেতো, হয়তো আমাদের জীবনের ধারাই বদলে যেতো সে-মুহূর্ত থেকে—কিন্তু অংশু তা করলো না, ওর লেখার চেয়ারে ব'সে টেবল ল্যাম্প জ্বেলে, সিগারেট ধরিয়ে, কয়েকটা কথা বললো। 'জয়ন্তবাবু মাতাল ছিলেন, আমি ওঁকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এলুম।' আমি শিউরে উঠে বললাম, 'মাতাল!' 'কেন, তুমি বোঝোনি?' 'না।' 'বোঝোনি? অংশু চোখ তুলে তাকালো কিন্তু সোজাসুজি আমার মুখে চোখ ফেললো না। আমার জবাব দেবার ইচ্ছে হ'লো না; মনে মনে ভাবলাম অংশু হয়তো বিশ্বাস করছে না আমার কথা, কিন্তু ওর বোঝা উচিত আমি জন্মবয়সে মদ কিংবা মাতাল দেখিনি (সিনেমায় ছাড়া), দেখে থাকলেও চিনতে পারিনি, ছেলেবেলা থেকে এমন আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি যাতে 'মদ' কথাটা শুনলেই আমার ভয় করে। একটু পরে অংশু আবার বললো (ঠোঁট বাঁকিয়ে, আমার দিকে না-তাকিয়ে), প্রেমিক পুরুষটি তেমন বীর নয় কিন্তু

মালতী, প্রেমনিবেদন করার জন্য মাতাল হ'তে হয়।' আমি হাঁটু মুড়ে বিছানায় বসেছিলাম, হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে তাকিয়ে রইলাম মেঝের দিকে, আমার শরীর যেন পাথর হয়ে গেলো। একটু পরে আবার অংশুর গলা পেলাম, 'আমি ওঁকে বলেছি এ-বাড়িতে ওঁর আর আসা-যাওয়া না-করাই ভালো—কথাটা ওঁর মগজে ঢুকলো কিনা তা অবশ্য বুঝলাম না।'

অংশু টেবল-ল্যাম্পটা এমনভাবে ঘুরিয়ে দিলে যাতে বিছানার দিকে ছায়া পড়ে, তারপর একটা বই সামনে রেখে কি লিখতে লাগলে—বোধহয় কোনো বিদেশী গল্পের তর্জমা, উপার্জন বাড়াবার উপায় হিসেবে সে যেটাকে বেছে নিয়েছে। রাত বোধহয় দেড়টা বা দুটো অবধি লিখলো সে-রাত্তিরে (কতটা লিখলো জানি না, অন্তত বসে রইলো, সিগারেট পোড়ালো); আমি চোখ বুজে-বুজে শুনলাম তার দেশলাই জ্বালার শব্দ, মাঝে-মাঝে খাতার পাতা ওল্টাবার শব্দ, কখনো বা চোখ মেলে দেখলাম তার আধখানা মুখ, যেন অচেনা কারো মুখ, যেন আমার কেউ নয়। মনে-মনে বললাম, 'অংশু, আমার একা লাগছে, খারাপ লাগছে, কষ্ট পাচ্ছি, তুমি এসো।' জয়ন্তর কথা ভাবলাম না, সাবধানে এড়িয়ে গেলাম কেননা ভাবতে গেলেই শিউরে উঠছি তখনও—মদ, ঘেন্না! মাতাল, ঘেন্না! জয়ন্তর কথা ভাবতে যে আমার খারাপ লাগছে সেই কষ্ট ঠেকাবার জন্য মনের একটা অংশকে বোবা করে রাখলাম। অবশেষে অংশু বই খাতা বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠলো (খুব সন্তর্পণে—ও কি ভাবছিলো আমি ঘুমুচ্ছি?), পা টিপে-টিপে বাথরুমে গেলো, আমি তার মুখ ধোবার শব্দ পেলাম (শোবার আগে দাঁত মাজতে ওর ভুল হয় না কখনো), ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। অবশেষে এক সময় সত্যি আমি আর না-কেঁদে পারলাম না, কিন্তু তাতেও অংশুর কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না—হয়তো সে সত্যি লিখছিলো, মাথা খাটিয়ে ক্লান্ত করেছে নিজেকে, ঘুমিয়ে পড়েছে, আমার অন্তত মনে হ'লো না আমার অস্তিত্ব বিষয়ে সে সচেতন।

কিন্তু আমার চোখে আর ঘুম এলো না সে-রাত্রে।

একদিন, দু-দিন, তিনদিন কাটলো, মনে-মনে বললাম আপদ চুকলো, আর হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না। সন্ধেবেলা রোজই আমি বেরিয়ে যাচ্ছি—কোনোদিন বুন্নিকে নিয়ে মা-র কাছে, কোনোদিন কোনো আত্মীয় বা পড়শীর বাড়িতে, বা কোনো বান্ধবীকে জুটিয়ে সিনেমায় বা অকারণে কিছু কেনাকাটা করি গড়িয়া-হাটে। ফিরে এসে বসার ঘরে ঢুকি না, অংশুও খোঁজ করে না আমার, জিগেস করে না কোথায় গিয়েছিলাম। 'প্রেমিক পুরুষটি তেমন বীর নয় কিন্তু, প্রেমনিবেদন করার জন্য মাতাল হতে হয়-' অংশুর এই কথাটা ঘুরে বেড়ায় ঘরের মধ্যে, শীতকালে বন্ধ ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ার মতো, আমার যেন দম আটকে আসে কেননা ঐ কথাটা আমারও কথা, আমি কখনো ভাবিনি যে জয়ন্ত—আমার বুকের মধ্যে ফাঁকা-ফাঁকা লাগে—না, জয়ন্তকে আর ভাববো না। আমি কুকুর পুষবো, বেড়াল পুষবো, গানের কলেজে ভর্তি হবো আবার, গীতভারতী উপাধি নিয়ে নিজেই খুলবো গানের স্কুল। কত কিছু আছে জীবনে, বুন্নি আছে, আমার আরো সন্তান হ'তে পারে, অংশু যদিও কিছুতেই তা চায় না তবু আমি জোর করবো। সাতদিন কেটে গেলো, হয়তো বা পনেরো দিন, হঠাৎ আমার মনে হ'লো হয়তো বা অন্যায় করছি জয়ন্তর উপর। যে একদিন, মদ খেয়েছে তাকেই কি মাতাল বলা যায়? এতদিন ধ'রে রোজ এসেছে জয়ন্ত, নেশাখোর হ'লে আগেই কি ধরা পড়তো না? আমাকে মনের কথা বলতে চাচ্ছে অনেকদিন ধ'রে—যদিও মুখ ফুটে বলার দরকার নেই, এমনিতেই বোঝা যায়, তবু পুরুষদের স্বভাবই এমন যে মুখের কথায় না বলে পারে না—কিন্তু সাহস পাচ্ছিলো না, আমি বিবাহিত, আমি মা, আমার স্বামী তার উপকার করেছেন—সাহস না-পাবার কারণ আছে প্রচুর, তার এই ভীরুতাকে নিন্দে করা যায় না, এটা তার বিবেকবুদ্ধিরই প্রমাণ দিচ্ছে, আর সেই ভীরুতা কাটাবার জন্য সেটাই যে যদি এমন কোনো উপায় নিয়ে থাকে যাতে মনের শাসন আলগা হয়ে যায়, সেটাই বা এমন কী

অপরাধ? আমার বিবাহিত জীবনকে সে শ্রদ্ধা করে বলেই তো ও-রকম অশোভন আচরণ তাকে করতে হলো সেদিন? আর তাছাড়া—মদ জিনিসটাকে আমি যে অমন ভয়ের চোখে দেখি সেটাই কি ঠিক যুক্তিসংগত? কত রকম কুসংস্কারে ভোগে মানুষ: আমরা এ দেশে গোমাংস খাই না, কিন্তু যারা খায় তারা তো দিব্যি আছে, আমাদের চাইতে অনেক বেশি ভালো আছে তারা। আর তাদের দেশেই ঘরে-ঘরে চলছে মদ, যার নাম শুনলে আমি শিউরে উঠি। যেহেতু আমি অনভ্যস্ত, তাই। যেহেতু জিনিশটা অজানা, তাই। আমার মনে পড়লো বিয়ের পরে প্রথম প্রথম অংশু যখন আমাকে কবিতা পড়াবার চেষ্টা করছিলো, কবিদের জীবনের কথাও শোনাতো সে আমাকে (তোমার মাস্টারি করাই উচিত ছিলো, অংশু, তুমি কথা বলতে বড্ড ভালোবাসো)—কেউ মদে মরেছে, কেউ বা তার মাস্টারমশায়ের বৌকে নিয়ে পালিয়েছিলো—তাদের প্রতি তো ভক্তি-ভালোবাসার অভাব দেখিনি অংশুর, তার কথায় এমন কোনো ইঙ্গিতও ছিল না যে ঐ কাজগুলি অন্যায়। কেন, তাঁরা কবিতা লিখেছিলেন বলেই সাতখুন মাপ। আর ঐ জয়ন্ত একদিন একটু বেসামাল হয়েছিলো বলেই তাকে আর দেখতে পাবো না আমি? জয়ন্ত কবি না-হতে পারে কিন্তু তার কি কোনই গুণ নেই? অংশুই তো কত প্রশংসা করেছে তার, সে কিছুদিন ডেটিন্যু ছিলো আর স্বাধীনতার পরে দণ্ডকারণ্যে আর আন্দামানে গিয়েছিলো রেফিউজীদের অবস্থা দেখতে, তাই তার জীবনটাকে অ্যাডভেঞ্চার বলতেও দ্বিধা করেনি—মোটের উপর অংশু কিছু কম গুণগান করেনি জয়ন্তর, যতদিন না-যতদিন না। কিন্তু—কী হয়েছে? আজ পর্যন্ত কী ক্ষতি করেছে জয়ন্ত এই পরিবারের? বরং অনেক কাজে লেগেছে অনেক সময়, অনেক সাংসারিক কাজ করে দিয়েছে যেগুলি আসলে অংশুরই কর্তব্য। যদি তার মনে কিছু থাকে—ধরা যাক আমার প্রতি কোনো দুর্বলতা—সে তো তার মনেই আছে, তাতে কারো গায়ে ফোসকা পড়ছে না। অন্তত তাকে করুণা তো করা যায়?

—মিথ্যা—কত মিথ্যা আমরা বানাই মনে-মনে, বুনে যাই মাকড়সার মতো, নিজেরাই জড়িয়ে থাকি সেই জালে যতক্ষণ না কোনো-এক হাওয়ার ঝাপটে তা ছিঁড়ে যায়, বা নিজের সঙ্গে এই প্রতারণায় নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে পড়ি একদিন। সেই দিনগুলি ভ'রে—জয়ন্ত যতদিন শারীরিকভাবে অনুপস্থিত ছিলো—আমি তার সপক্ষে কত না যুক্তি সাজিয়ে সাত রাজ্যি থেকে কুড়িয়ে-কাচিয়ে, বাচ্চারা যেমন তাসের পর তাস সাজিয়ে বাড়ি বানায়—দোতলার পর তেতলা তোলে, তেমনি কিন্তু সবচেয়ে বড়ো যুক্তিটা কখনো উচ্চারণ করিনি নির্জনে, মনে-মনে, ঘুমিয়ে পড়ার আগে—কখনোই না।

সেদিন-রবিবার, দুপুরে খাওয়ার পরে অংশু বললো, "চণ্ডালিকা'র তিনটে টিকিট পেয়েছি, বুন্নিকে নিয়ে যাবে নাকি তুমি?" 'চতুর্মুখের "চণ্ডালিকা"?' হ্যাঁ, তাদেরই বোধহয় ভালোই হবে।' আমার জবাব না-পেয়ে আবার বললো, 'তুমি যেতে না চাও তো আমি যাই বুন্নিকে নিয়ে—বুন্নির জন্যই যাওয়া।' আমি হঠাৎ বললাম, 'তুমি কি চাও না আমি যাই?' 'তোমার অন্য কোথাও যাবার থাকতে পারে—আমি কি করে জানবো?' জবাব দিলাম 'আমার অন্য কোথাও যাবার নেই।' 'তবে চলো। ঠিক সোয়া-পাঁচটায় বেরোতে হবে।' অংশু যথারীতি একটা বই খুলে ধরলো মুখের সামনে (যদি সে একটু কম পড়তো, একটু বেশি অন্যের মন বুঝতে পারতো!), আর আমার মনে হ'লো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ-ধরনের কথাবার্তা বোধহয় অ-সাধারণ, এমনকি হয়তো অস্বাভাবিক, তারপর ভাবলাম কিছুদিন ধরে এই ধরনেরই কথাবার্তা অংশুর সঙ্গে আমার—রক্তমাংস নেই, কঙ্কালের মতো, আর এর বেশি বলার কোনো ইচ্ছে নেই কোনো পক্ষেরই, যেন সামর্থ্যও নেই।

মঞ্চসজ্জা তেমন ভালো ছিলো না, বেশবাস নিতান্ত গতানুগতিক, ছোটো ভূমিকাগুলির অভিনয় চলনসইমাত্র, কিন্তু চমৎকার জোরালো যন্ত্রসংগীত চলছিলো নেপথ্যে, বেহালা বাঁশি ঢোল কর্তালের অর্কেস্ট্রা—মাঝে-মাঝে বৃষ্টির মতো শরদ—সেই বাজনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুরগুলোর একটা উত্তর প্রত্যুত্তরের খেলা চলছিলো যেন—আর প্রকৃতি আর তার মা দু-জনেই নাচে অতি

নিপুণ, তাদের টানা চোখ, বাহুর ভঙ্গি, আঙুলের লীলা, তাদের মুখের আশ্চর্য দ্রুত ভাবপরিবর্তন—সব মিলিয়ে মুগ্ধ করে দিলো আমাকে, আমি চেয়ারে বসে শরীরটি দোলাতে লাগলাম আস্তে-আস্তে, ঠোঁট নেড়ে, শব্দ না করে প্রতিটি গানের প্রতিটি কথা গাইতে লাগলাম মনে-মনে, এক আশ্চর্য আশাতীত সুখ হঠাৎ আমার বুক ছাপিয়ে উপচে পড়লো। হয়তো সেইজন্যেই সেই রাত্রিটিকে এখন স্পষ্ট মনে আছে আমার, পরে অংশুর সঙ্গে আমার কথাবার্তা, তারপর বাড়ি ফিরে যা-কিছু হয়েছিলো কিছুই মনে হয় ভুলিনি, যেন পর-পর সাজানো আছে সব, যেন আমাদের ভুলে যাওয়ায় ভরা জীবনের স্রোতের মধ্যে রাত্রিটি একটি দ্বীপ হয়ে জেগে আছে। অন্য এক জগৎ যেখানে দুঃখ কষ্ট দ্বন্দ্ব সবই আছে কিছুই কষ্ট দেয় না, যেখানে কিছুই মলিন নয়, কোনো জোড়াতালি নেই, কোনো মিথ্যে নেই, যেখানে সব মিলে যায়, সব উজ্জ্বল সব স্বাধীন—যে জগৎ একদিন ছিলো আমারও বা হতে পারতো, আমার গানের কলেজে এই প্রকৃতির ভূমিকায় আমিও একবার নেমেছিলাম। বিয়ের পরেও অনেকদিন পর্যন্ত আমরা আসতাম মাঝে মাঝে—অংশু আর আমি—বিশেষ কোনো নাটকে বা গানের জলসায় (নাটকে উৎসাহ আছে অংশুর, আর একমমাত্র যে-গান সে ভালোবাসে তা হলো রবীন্দ্র-সংগীত); কবে থেকে এমন হলো যে আর আসি না, কবে থেকে এমন হলো যে রেডিওতেও কান পাতি না, মাঝে-মাঝে—ওটা চালায় শুধু বুন্নি। একবার একটা ঢোঁক গেলার মতো শব্দে মুখ ফেরালাম, মনে হলো শব্দটা অংশুর গলার, হঠাৎ একবার আবছা আলোয় লক্ষ্য করলাম সে হাতের তেলোতে চোখ মুছলো। নাটক শেষ হলো; বেরিয়ে আসার গলিতে দু-তিনজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। একজনের কথার উত্তরে অংশুকে বলতে শুনলাম, Well, that Old man!' রাস্তায় বেরিয়ে অনেকটা আপন মনে বললে, 'আশ্চর্য! অত সহজ, সরল, মাঝে-মাঝে সেন্টিমেন্টল—কিন্তু হঠাৎ এক-একটা ঝাপটে কোন উঁচুতে উঠে যায়।' যদিও মাসের শেষ, নয়নাংশু ট্যাক্সি নিলে, যেতে-যেতে বুন্নি ঘুমিয়ে পড়লো ওর বাবার কোলে মাথা আর আমার কোলে পা রেখে; হঠাৎ যেতে যেতে অংশু বললো, 'তুমি কি লক্ষ্য করেছো মায়ের মুখে একেবারে ঘরোয়া ভাষা বসানো হয়েছে, কিন্তু মেয়ের মুখের ভাষা অনেকটা পোশাকি—তোমার কি মনে হয় এটা ঠিক হয়েছে?' আমি জবাব দিলাম, 'কী যেন, ভেবে দেখিনি কখনো—আমি সুরের দিকে এত মন দিই যে কথাগুলো ঠিক শুনতে পাই না!' 'সেটা ভুল—রবীন্দ্র-সংগীতে কথাগুলোতেই ম্যাজিক।' একটু পরে অংশু আবার বললো, 'না—বোধহয় ঠিক বললাম না—বিশেষতঃ এই নৃত্যনাট্যগুলিতে কথাগুলো সুরের মধ্যে এমনভাবে গলে যায় যে কিসের জন্য কী হচ্ছে তা ভেবে দেখারই সময় পাই না আমরা। তবু-তা ভেবে দেখারও দরকার আছে।' বাড়ি ফিরে এসেও অংশু এ-প্রসঙ্গ ছাড়তে পারলো না, অনর্গল কথা বলতে লাগলো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, 'চণ্ডালিকা' বের করে পাতা ওল্টাতে লাগলো, তার মুখে-চোখে এক অন্য ধরনের উজ্জ্বলতা আমি দেখতে পেলাম। 'এই যে পেয়েছি—এই জায়গাটা—

হে পবিত্র মহাপুরুষ,
আমার অপরাধের শক্তি যত
ক্ষমার শক্তি তোমার
আরো অনেকগুণে বড়ো।
তোমারে করিব অসম্মান,
তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম।

—হঠাৎ এখানে মা-ও সাধু ভাষায় কথা বলছে। ছাপার অক্ষরে একটু বেসুরো লাগছে—বিশেষতঃ ঐ "করিব" শব্দটা—কিন্তু সুরে গাইলে—আচ্ছা, তোমার মনে আছে সুরটা?" ব'লে অংশু আমার দিকে তাকালো—ইদানীং কখনো এমন হয় না যে ও আমার গান শুনতে চায়-আমি গেয়ে শোনালাম। অংশু একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'না—কিছু বলার নেই, এর উপরে কোনো কথা নেই।

সে রাত্রে শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়লাম দু-জনেই গভীর নরম সুন্দর ঘুম—কিন্তু অনেক রাত্রে আমার ঘুম খুব কোমলভাবে ভেঙে গেলো, আমি অনুভব করলাম অংশুর হাত আমার কাঁধের উপর। চোখ মেলে অন্ধকারে দেখতে পেলাম ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে—আমার মুখের উপর নিচু হয়ে আমার গালের উপর ওর নিশ্বাস টের পেলাম। ছোট্ট একটা সুখের স্রোত বয়ে গেলো আমার শরীরে—অনেকদিন পর অংশুর স্পর্শে, কোনো পুরুষের স্পর্শে—কিন্তু একটু পরেই সেই সুখের বদলে একটা কষ্ট যেন আমার গলা ঠেলে উঠলো—একটু অভাববোধ—হাহাকার—যেন আমার বুকের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে আর আমি তা এইমাত্র টের পেলাম। অংশু আমার পাশে শুয়ে পড়লো, আমার মুখটা টেনে নিলো ওর মুখের উপর; আমার মন সাড়া দিলো না তবু যথোচিত অঙ্গভঙ্গি করলাম, ওকে সমর্পণ করলাম কিছুক্ষণের মতো এই শরীর। জানি না অংশু ও থেকে কী পেলো, কিছু পেলো কিনা—কিন্তু আমার মনে বিশ্রী একটা ভাব জেগে উঠলো, আমার উপর এই শরীরের উপর অংশুর যে দাবি আমি সেজন্যে ওকে ক্ষমা করতে পারলাম না যেন, আবার অংশুর প্রতি এই বিরুদ্ধতার জন্য নিজেরও উপর রাগ হতে লাগলে।

আমার ঘাড়ে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছিলো অংশু—যেন উপন্যাসে বর্ণিত একটি সুখী প্রেমিক, ভারি শান্ত ওর নিশ্বাস, শিশুর মতো, ভাবটা যেন হারানো সুখ ফিরে পেয়েছে। আমি ওকে ঠেলা দিয়ে বললাম, 'ওঠো, নিজের বিছানায় যাও।' 'কেন, থাকি না এখানে।' 'তারপর যদি ঘুম না ভাঙে। যদি সকালে বুন্নি এসে দ্যাখে?' ঘুমে ভারি শরীর নিয়ে উঠে গেলো অংশু। আমার মনের তলা থেকে একটা কথা আস্তে-আস্তে ভেসে এলো উপরে। আমার রাগ, কষ্ট—অংশুর প্রতি বিরুদ্ধতা; সবই জয়ন্তর জন্য। তাকে ভুলতে পারিনি মুহূর্তের জন্য, তাই কষ্ট। একসঙ্গে-'চণ্ডালিকা' দেখলাম অংশু আর আমি, একটা অন্য ধরনের আনন্দ পেলাম একসঙ্গে—ইন্দ্রিয়ের, তবু ইন্দ্রিয়ের নয়—তাতে জয়ন্তর কোনো অংশ ছিলো না। কোনো কিছু সুন্দর—আমাদের লাভের বাইরে, লোভের বাইরে—যাকে হয়তো বা পবিত্র বলা যায়,—তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য মিলিত হয়েছিলাম অংশু আর আমি; জয়ন্ত বাইরে প'ড়ে ছিলো একটু আগে আমার শরীরও আমি অংশুকে দিলাম, অংশু নিজেকে সুখী ভেবে ঘুমিয়ে পড়লো আর জয়ন্তকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এই বাড়ি থেকে, যেহেতু অংশু আমার স্বামী সে তাড়িয়ে দিয়েছে জয়ন্তকে—আমার দিকে তাকায়নি, আমার কথা ভাবেনি। রবীন্দ্রনাথের সুর একটা সম্মোহন ছড়িয়ে দিয়েছিলো তখন, আমি যেন নিজেকে ভুলে ছিলাম, অংশুকে আমার মনে হচ্ছিল ভালো, খুব বুদ্ধিমান, 'চণ্ডালিকা' বিষয়ে ওর কথাবার্তা অসাধারণ মনে হচ্ছিলো—কিন্তু ঘন্টাগুলির মধ্যে গানের পাখিরা আমাকে ছেড়ে উড়ে চ'লে গেছে, আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার তখনকার মন—যে মন নিয়ে দেখলে অংশুকে ভালো আর বুদ্ধিমান বলে মনে হয়—হঠাৎ জেগে অংশুর স্পর্শে সব বাস্তব ফিরে এসেছে। অংশু নিজেকে সুখী বলে ভাবছে আর আমিই তার কারণ, এটাকে আমি কেমন করে মেনে নিই, বা সহ্য করি—যখন জানি যে জয়ন্ত কষ্ট পাচ্ছে আমার জন্য, আমারই মতো কষ্ট পাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, কিন্তু আমার জীবনে সান্ত্বনার কারণ যেটুকু আছে তাও নেই তার। আমার হিংসে হলো অংশুকে, নিজেরই উপর হিংসে হলো, যেহেতু আমরা এমন কোনো-কোনো সুখ পেয়েছি, বা পেয়েছিলাম, বা ভবিষ্যতে পেতে পারি, যা জয়ন্তকে মঞ্জুর করেনি তার জীবন। রুগ্ন এবং অতি সাধারণ স্ত্রী, ঈষৎ মাথা-খারাপ হওয়া বুড়ি বিধবা মা, ছেলেপুলে, অভাব-অনটন—এ-সবের মধ্যে দিয়ে দিন কাটে জয়ন্তর, বা কাটছিলো, যতদিন না দেখা হয়েছিলো আমাদের সঙ্গে। আর যেহেতু তার জীবন সম্বন্ধে আমি শুধু সেটুকুই জানি যা সে নিজে আমাকে বলেছে, যেহেতু আমার বাড়িতে বা কর্মস্থলে আমি তাকে দেখিনি কখনো, তাই প্রথম উৎসাহের ঝোঁকে অংশু যা বলেছিলো তারই উপর নির্ভর করে—আমি তাকে দেখতে পেলাম যেন জীবনযুদ্ধের এক সৈনিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে চলেছে,

বাঁধা চাকরি ক'রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সপ্তাহে-সপ্তাহে—আমার মনে হলো তারও অনেক গুণ আছে দারিদ্র্যের তলায় চাপা যাচ্ছে, কিংবা লোকেরা যা দেখেও দেখছে না। মনে হলো জয়ন্তকে আমি আনবো এ-বাড়িতে—যে করে হোক—আমি তাকে ফুটিয়ে তুলবো, আশ্রয় দেবো, মনে হ'লো এ সংসারে আমিই তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, আমি তার পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাকে বঞ্চিত করা আমার অধর্ম হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছটফট করে অবশিষ্ট রাত কাটিয়ে দিলাম,—এই ঘরে, আমার স্বামীর পাশাপাশি এই বিছানায়।

পরের দিন নিরিবিলি দুপুরে আমি একটা প্যাডের কাগজে লিখলাম, 'জয়ন্ত, ফিরে এসো।' নিজের হাতের লেখায় ঐ তিনটে শব্দের দিকে তাকিয়ে রইলাম খানিকক্ষণ, যেন ভাবতে লাগলাম কথাগুলোর কী অর্থ, কেন ওখানে লেখা হয়েছে, দাগা বুলিয়ে-বুলিয়ে মোটা করে তুললাম কথাগুলিকে। হঠাৎ অন্য একটা সম্ভাবনায় চমকে কেঁটে উঠলাম আমি—জয়ন্ত কলকাতা ছেড়ে চলে যায়নি তো?' দৈব—নিতান্ত দৈব্যের উপরে নির্ভর করে যাকে আমরা এই জীবনে সুখ বলে থাকি! স্বাধীন মানুষ সে, তার উপর বেপরোয়া—চলে যাবার বাধা কী? নয়নাংশু আর তার স্ত্রীর জীবনে যাতে ভাঙন না ধরে, হয়তো সেই জন্যই নিজে মাথা পেতে নিয়েছে কষ্ট, অপমান, পরাজয়—তার 'বর্তমান' পত্রিকা কি বেরোয় এখনো? সে তো পাঠায় একটা করে এ-বাড়িতে, সম্প্রতি এসেছে কি? বসার ঘরে র‍্যাকটাতে আমি খুঁজতে লাগলাম—নানারকম পত্রিকা সেখানে রেখে দেয় অংশু, কিন্তু না—একটাও 'বর্তমান' নেই। তাহলে কি উঠে গেলো, না কি হাত-বদল করেছে? অংশু নিশ্চয়ই জানে কিন্তু আমাকে বলেনি। হয়তো অংশুই চেষ্টা করে তাকে কোনো কাজকর্ম জুটিয়ে দিয়েছে পাটনায় কি ভুবনেশ্বরে। সে মুহূর্তে আমার ধারণা হলো যে অংশু তলায়-তলায় চক্রান্ত করেছে জয়ন্তকে উচ্ছেদ করার জন্য—সে চায় না আমার কোনো নিজস্ব বন্ধু থাক, চায় না আমার দিকে কেই একটু বেশি মনোযোগ দিক—স্বার্থপর, হিংশুক নয়নাংশু। কিন্তু জয়ন্ত, তুমিও কি আমার কথা ভাবলে না।

ঠিক তখনই জয়ন্তকে দেখতে পেলাম আমার সামনে বসার ঘরে পত্রিকার র‍্যাক থেকে চোখ ফেরানোমাত্র। বিশ্বাস করতে একটু সময় লাগলো।

পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে, পরিপাটি সিঁথি করে চুল আঁচড়ানো, একটু যেন রোগা হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললো, 'আবার না এসে পারলাম না, আর-একবার চোখে না-দেখে পারলাম না। কিন্তু যদি না চাও—তোমরা যদি না চাও—তাহলে আমি এক্ষুণি চলে যাবো, সারা জীবনে আর দেখতে পাবে না আমাকে।'

আমি সারা শরীরে কেঁপে উঠলাম, অসহায়ভাবে বসে পড়লাম একটা চেয়ারে, আমার হৃৎপিণ্ড দপদপ করে লাফাতে লাগলো। অনেকক্ষণ কাটলো কথা না-বলে, পরস্পরের দিকে না-তাকিয়ে, শুধু পরস্পরের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ হয়ে। তারপর জয়ন্ত বললে, "লোটন, আমাকে ক্ষমা করবে না? আমার দিকে তাকাবেও না? আমি তাকিয়ে দেখলাম তার কালো চোখ আগুনে ভরা।

বুন্নি স্কুল থেকে ফিরে লাফিয়ে উঠলো তার জন্তি-কাকাকে দেখে, জয়ন্ত তাকে চুমু খেয়ে আদর করলে। অংশু আপিশ থেকে ফিরে হঠাৎ একটু থমকালো, তারপরেই সহজভাবে বললো, 'এই যে জয়ন্তবাবু, কেমন আছেন?' আরো সহজভাবে জয়ন্ত জবাব দিলো, 'মিসেস মুখার্জি, আপনার স্বামী একটি অসাধারণ মানুষ—আমার মতো দুর্বৃত্তকেও সহ্য করছেন'—এমনি করে আমাদের স্বাভাবিক জীবন বা অস্বাভাবিক জীবন, আবার শুরু হলো, আর তখন থেকেই আমি দ্রুত এগিয়ে এলাম আজকের এই পরিণামের দিকে।

আমি দোষ করেছি? কিন্তু কী করতে পারতাম আমি, আমিও তো রক্তমাংসের মানুষ, কেমন করে আমি ফেরাবো তাকে, আর কেনই বা ফেরাবো যে চায় আমাকে, তার মন-গড়া বা হাতে-গড়া কোনো পুতুলকে নয়—আমাকে, আমাকে, আমাকেই? যে-কদিন জয়ন্ত এ বাড়িতে আসেনি

(সব সুদ্ধ পনেরো বা কুড়িদিন হবে হয়তো), সেগুলি অতি সহজে মুছে গেলো আমার মন থেকে, যেন তাদের অস্তিত্ব কখনো ছিলো না, যেন জয়ন্ত চিরকাল ধ'রে ছিলো এ বাড়িতে, চিরকাল ধ'রে থাকবে। কত অসংখ্য উপায়ে সে জানিয়েছে যে আমি তার জীবনের কেন্দ্র, তার সর্বস্ব—সেই নিষ্ঠার কোনো মূল্য আমি দেবো না—আমি কি হৃদয়হীন? কতদিন এমন হয়েছে যে বাড়িতে লোকজনের ভিড়, আত্মীয়েরা এসেছেন, আমি কত ব্যস্ত হয়ে এ-ঘর ও-ঘর করছি, জয়ন্ত ধৈর্য ধরে বসে থেকেছো ঘন্টার পর ঘন্টা আমাকে অবশেষে মিনিট পনেরো একা পাবার জন্য। (একা পাওয়া মানে অন্য কিছু নয়—হয়তো শুধু চোখে-চোখে তাকানো, হয়তো কিছু কথা—আমারই সংসারের কথা—বা জয়ন্তর জীবনের কোনো টুকরো, ডেটিন্যু ক্যাম্পের, দণ্ডকারণ্যের কোনো গল্প।) আমাদের আত্মীয়দের সঙ্গে মেলামেশায় সে স্বচ্ছন্দ, বন্নির সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে, আমার সংসারের খুটিনাটি কিছুই তার চোখ এড়ায় না, কেমন ক'রে যেন এই বাড়ির সঙ্গে সে মিশিয়ে দিয়েছে নিজেকে। আমি বুঝতে পারি নয়নাংশু এটাকে ভালো চোখে দেখছে না, তা দেখবে বলে আশা করা যায় না তাও মানি, আমি দেখতে পাই দিনে-দিনে একটা থমথমে মেঘ জমে উঠছে তার মনে, বুঝতে পারি তার সঙ্গে আমার মিলিত জীবনটায় আমরা কেউ মজবুত হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। দুঃখের—কিন্তু প্রতিবিধান কি আমার হাতে ছিলো! না, এ-বাড়ির কর্তা তো অংশুই, সব সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে—সে কেন হাল ছেড়ে দিয়েছিলো, জয়ন্তকে একবার বিতাড়িত করেও আবার কেন মেনে নিয়েছিলো, কেন আরো রূঢ় হয়নি, জবরদস্ত শাসন করেনি আমাকে—কেন, কেন তার দিক থেকে ছিলো শুধু অভিমান, মেয়েলীপনা, রক্তহীন ভদ্রলোক হবার চেষ্টা শুধু?

না—আমি ভুল—ভাবছি, সব ভুল। এক হাজার একশো উপায়ে নিজেকে আর অন্যকে আমরা ঠকাতে পারি, সেই চালুনির ছিদ্র দিয়ে কখন গ'লে বেরিয়ে যায় আমরা যার নাম দিয়েছি ভালো আর মন্দ, ন্যায় আর অন্যায়। না—ও-সব কিছু নেই, আছে শুধু ইচ্ছে, ইচ্ছেই আমাদের চালিয়ে নেয়, আর প্রতিটি মানুষ এমনিভাবেই তৈরি যে একজনের ইচ্ছের সঙ্গে আর একজনের ইচ্ছে কিছুতেই পুরোপুরি মেলে না। স্বামী-স্ত্রীকে সব সময় একসঙ্গে থাকতে হয় বলে এই গরমিলগুলো সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে তাদেরই জীবনে—অধিকাংশ ব্যাপারে তাতে খুব কিছু এসে যায় না, অধিকাংশ ব্যাপারেই আপোস চলে, জেনে নেয়া, মানিয়ে নেয়া সম্ভব হয়, কিন্তু কখনো কোনো ইচ্ছে যদি প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে, যদি ছায়া ফ্যালে সমস্ত জীবনের উপর, তাহলে কেউ কি বলতে পারে কোনটা 'উচিত' বা 'অনুচিত'! কে ঠেকাবে সে অদম্য বেগ, সেই এঞ্জিনের বয়লারে পোড়া বাষ্প! কথাটা হচ্ছে : এই বারো বছর ধরে অংশুর ইচ্ছেমতোই সব হয়েছে, এবার কি আমার ইচ্ছেমতো কিছু হ'তে পারে না? আমি কি শুধু নয়নাংশুর স্ত্রী, একজন স্বাধীন মন-সম্পন্ন মানুষ নই?

কেউ যেন না ভাবে আমি নয়নাংশুর দুঃখ দেখতে পাইনি বা চেষ্টা করিনি তাকে সান্ত্বনা দিতে। তখন পর্যন্ত জয়ন্তর সঙ্গে কিছুই হয়নি আমার, কিন্তু আমি দেখছি নয়নাংশু কেমন অদ্ভুত বদলে যাচ্ছে, হাসি কমে গেছে মুখের—আমি কিছু জিগেস করলে ভালো করে জবাব দেয় না—অন্তত একজন মানুষের কাছে আমি যে তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি এইটেই ভালো লাগছে না তার। আমি কি তখন কম চেষ্টা করেছি নয়নাংশুকে খোশমেজাজে রাখতে? রাঁধতে আমি ভালোবাসি না, উনুনের আঁচে আমার মাথা ধরে, কিন্তু এ সময়ে আমি নিজের হাতে রান্না করেছি যা-যা তার বিশেষ পছন্দ, ঝি-চাকর থাকা সত্ত্বেও তার শার্ট-প্যান্ট ইস্ত্রি ক'রে দিয়েছি নিজের হাতে, জুতো পালিশ ক'রে দিতেও পরোয়া করিনি। সে আরামপ্রিয় মানুষ, তার উপর একটু পরিচ্ছন্নতার বাতিক আছে—আমি অনেক খেটে অনেক যত্নে ঝকঝকে রেখেছি ফ্ল্যাটটিকে, আলোয় নতুন শেড আর সোফায় নতুন ঢাকনা পরিয়ে উজ্জ্বল রেখেছি বসার ঘর—কিন্তু সে-সব যেন চোখেই পড়েনি তার। অথচ আমার হাতে কোনো একটি ছোট কাজও জয়ন্তর চোখ এড়ায় না, যদি কোনোদিন কানের দুল

বদল করি তা পর্যন্ত লক্ষ করে সে, আমি যখন টিপট থেকে চা ঢালি তখন টের পাই তার দৃষ্টি আমার হাতের উপর।

আমার কি উচিত ছিল নয়নাংশুকে শরীর দিয়ে ভুলিয়ে রাখা? কিন্তু সেটাই কি হ'তো না সত্যিকার কদর্য আচরণ? কী করবো, ঐ রকমই হ'য়ে গিয়েছি আমি, ওকে আমি সুখী করতে চাই অথচ ওর শরীরটাকে আমি আর সুনজরে দেখি না, ও কখনো খালি গায়ে বাথরুম থেকে বেরোলো আমি চোখ ফিরিয়ে নিই, ওর সঙ্গে এখনো আমাকে এক ঘরে ঘুমোতে হচ্ছে তাতেই আমার দম আটকে আসে মাঝে-মাঝে। যদি ভালোবাসার শরীর না-থাকতো, তাহলে কতই না সুখী হ'তে পারতাম আমি আর নয়নাংশু। সে কি ঐ দুটোকে আলাদা ক'রে নিয়ে সুখী থাকতে পারে না? আমি একটু আশা পেয়েছিলাম যেদিন ওর আপিশের অপর্ণা ঘোষকে ও চায়ে বলেছিলো; পার্ক স্ট্রীটের মেক-আপ, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে, কথাবার্তায় চটপটে—নয়নাংশুর বিষয়ে ভাবটা বেশ গ'লে যাওয়া—কিন্তু না, ও বেশি দূর এগোবে না, ও বড্ড গুমরানো মানুষ, বাঁকাট্যারা, কিছুই ও সহজে নিতে পারে না, সহজভাবে সুখী হবার ক্ষমতা ওর নেই।

তোমরা কি শুনতে চাও যে আমি অংশুকে ভালোবাসি না—এখন আর বাসি না—আর জয়ন্তকে ভালোবাসি? না, ও-সব ভালোবাসাবাসি অংশুর মতো লোকদের বানানো ব্যাপার—একটা ধারণা, কল্পনা, হয়তো একটা আদর্শ যার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে না কেউ, আর সেই আপসোসে তা নিয়ে শুধু কথা বলে। এমন মানুষ কে আছে যে অন্য একজনের সব ইচ্ছে মেটাতে পারে? অল্প বয়সে এক ধরনের মন থাকে, চনচনে চাঙ্গা থাকে অব্যবহৃত শরীর, হঠাৎ কোনো একজনের সব-কিছুই ভালো লেগে যায়, অন্য সব মানুষ থেকে আলাদা ক'রে নিই তাকে, মনে হয় তাকে পেলে আর কিছু চাই না—কিন্তু তখন তাকে পাওয়া গেলো, ধরা যাক তারই সঙ্গে বিয়ে হ'লো যখন, তখন সেই মোহাচ্ছন্ন ভাবটা এক গ্রীষ্মেই ঝ'রে পড়ে, এক বর্ষার জলেই ধুয়ে যায়। তারপর থাকে স্বার্থ, থাকে একত্র বসবাসের ফলে মমতা, থাকে অভ্যাস, পরানো চটিজুতোর আরাম—আর থাকে শরীর। কিন্তু শরীরও কত সহজে ক্লান্ত হয় বিমুখ হয়, কত সহজে অন্য সুখের স্বপ্ন দ্যাখে—যদি না কারো বোকা হ'য়ে জন্মাবার মতো সৌভাগ্য হয়, কিংবা চোখে থাকে এমন ঠুলি যাতে সামনের মানুষটিকে ছাড়া আর-কিছুই সে দেখতে পায় না। জয়ন্ত আমাকে যতকথা বলেছে, তারমধ্যে 'ভালোবাসা' কথাটা একবারও উচ্চারণ করেনি—আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ তার কাছে; এদিকে অংশু আমাকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে পাগল ক'রে দিয়েছে আমি তাকে 'ভালোবাসি' কিনা তা জানার জন্য।

ধরো আমি যদি ঝর্নার মতো হতাম—আমার কলেজের বন্ধু ঝর্না। বিয়ের পরে একদিন এলো ওর এঞ্জিনিয়ার স্বামীকে নিয়ে, যতক্ষণ ছিলো ওর স্বামীর মুখ থেকে প্রায় চোখ সরালো না, তিনি যে কোনো একটা কথা বললে কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ে আর আমাদের সকলের দিকে এমনভাবে তাকায় যেন কোনো গভীরতম জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। ওর স্বামী বললেন, 'কালো বাজারিদের ধ'রে-ধরে গুলি ক'রে মারা উচিত।' তক্ষুণি ঝর্নার মাথা ন'ড়ে উঠলো—'নিশ্চয়ই। মারাই উচিত।' স্বামীটি বললেন, 'আমাদের দেশে, মশাই, গণতন্ত্র-ফনতন্ত্র চলবে না। ডিক্টেটরশিপ চাই।' সঙ্গে-সঙ্গে ঝর্না ব'লে উঠলো, 'তা কিন্তু সত্যি। ডিক্টেটরশিপ দরকার আমাদের।' আবার কী-সব পাগলের মতো কথা! 'বাংলায় কি আর ফিজিক্স কেমিস্ট্রী পড়ানো যায়।' নয়নাংশু বললো, 'কেন যাবে না? জাপানিরা তো তাদের ভাষাতেই পড়াচ্ছে।' 'ও-সব ছেড়ে দিন—আমাদের ইংরিজি ছাড়া বাচবে না' 'তাই তো! ইংরিজি ছাড়া চলে কী করে?' ব'লে ঝর্না মাথা নেড়ে-নেড়ে আমাদের সকলের দিকে তাকালো। এমনি সারাক্ষণ। আমি মনে-মনে বললুম, ঝর্নাটা এত বোকা তা জানতাম না তো—তা একটু বেশি বয়সে বিয়ে হয়েছে নুতন বিয়ের ঘোর চলেছে এখনো, কেটে যাবে। কিন্তু পাঁচ বছর পরেও দেখলুম ঝর্না সেই একই আছে—মোটা

হয়েছে এর মধ্যে, তিনটি বাচ্চার মা হয়েছে, স্বামীর গাড়িতে আসে আমার কাছে হঠাৎ-হঠাৎ, যতক্ষণ থাকে ঘুরে-ফিরে ওর স্বামীর কথাই বলে 'উনি এই বলেন, এই করেন, এই ভালোবাসেন, উনি রোজ সন্ধেবেলা 'ড্রিঙ্ক' করেন আজকাল, রোববার দশটার আগে ঘুম থেকে ওঠেন না' –সবই যেন ভারি জাঁক করার মতো, দশজনকে ডেকে শোনাবার মতো ব্যাপার। আমি মনে মনে অনেক হেসেছি ঝর্নাকে নিয়ে, কিন্তু কে জানে ওর বোকামিটাই হয়তো ঠিক, হয়ত সে-সব বিয়েই সারাজীবন ঠিকমতো চলে যেখানে এক পক্ষ নিজেকে ছোটো আর অধীন ব'লে মেনে নেয়—আর সাধারণত ঐ পার্টটা মেয়েদেরই নেবার কথা, তাদেরই মানায় ওটা—আর জীবনে যদি সুখটাই লক্ষ্য হয় তাহলে সে-সুখ কেমন ক'রে পাওয়া গেলো তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? বেশ আছে ঝর্না তার 'উনি'কে নিয়ে, কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা জানবে না ওরা কোনোদিন, শেষ হিসেবে ওরাই কি জিতে গেলো না? —কিন্তু মুশকিল এই যে আমি ঝর্না নই, আর নয়নাংশুও যে-রকম আইডিয়াবাজ মানুষ তারও বড্ড পানসে লাগতো ঝর্নার মতো বৌ হ'লে।

একদিন কথা হচ্ছিলো জয়ন্তর পত্রিকা নিয়ে; নয়নাংশু বললো, 'আপনার "বর্তমান"-এর ব্লকটা এবার বদলে নিন-দন্ত্য 'ন'টাকে মূর্ধণ্য 'ণ'-র মতো দেখায়। জয়ন্ত বললো, 'সত্যি কি কিছু এসে যায় তাতে?' 'ক-টাকাই বা খরচ—বদলে নেয়াই ভালো। একেবারে মলাটে তো-খারাপ দেখায়।' জয়ন্ত একটু বাঁকা হেসে সিগারেট ধরালো, নয়নাংশু আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে আবার বললে, 'আর একটা কথা; আপনার পত্রিকায় "কুৎসিত" কথাটা প্রায়ই ভুল ছাপা হয়—খণ্ডত দিয়ে, আর 'হাসপাতাল"-এ থাকে চন্দ্রবিন্দু। এগুলিও ঠিক ক'রে নিলে পারেন।' এর উত্তরে কিছু বলার আগেই আমি বললুম, 'কোন, 'কুৎসিত" তো খণ্ডত দিয়েই লেখে।' 'প্রথমটা-পরেরটা নয়।' এবারে জয়ন্ত মৃদু হেসে বললো,'আমি কিন্তু বরাবর ঐ রকমই লিখি—দুটো খণ্ডত দিয়ে।' 'আরো অনেকে তা-ই লেখেন বটে, কিন্তু ভুলটা ভুলই।' 'ভুল কেন?' 'ওটা খাঁটি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত বানানেই লিখতে হবে।' 'না লিখলে ক্ষতি কী? দুটো খণ্ডত দিয়ে "কুৎসিত" লিখতে অর্থটা কি বোঝা যাবে না?' 'তাহ'লে কি আপনি বলছেন শুদ্ধ আর অশুদ্ধ ব'লে কিছু নেই?' 'আপনার মতে আছে, কিন্তু আমার মতটা অন্যরকম। আমি তো বলি হাঁচি-টিকটিকির মতো বানানও একটা কুসংস্কার।' 'কিন্তু বাংলা ভাষা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়—আপনি আমি যা খুশি তা-ই করতে পারি না তা নিয়ে।' এর উত্তরে জয়ন্ত বললো, 'দেখুন মশাই, আমি খেটে খাই, প্রতি সপ্তাহে পনেরো কলম ক'রে লিখতে হয় আমাকে, বানান নিয়ে অত মাথা ঘামালে আমার চলে না। ও-সব আপনাদের মতো বাবুদের বিলাসিতা।' আমি দেখলাম নয়নাংশুর মুখটা লাল হ'য়ে উঠলো, 'আপনারা বসুন আমার একটু কাজ আছে,' ব'লে শোবার ঘরে চ'লে গেলো।

ঝগড়াঝাঁটি বিচ্ছিরি লাগে আমার, নয়নাংশুর মেজাজ খারাপ দেখলে তাই চুপ ক'রে থাকি, কিন্তু, সে-রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে আমি কথা-না বলে পারলাম না। 'তখন ও-রকম হঠাৎ উঠে গেলে কেন তুমি?' 'আমার ভালো লাগছিলো না ওখানে ব'সে থাকতে।' 'তাই ব'লে অভদ্রতা করবে?' 'কেন, আমি না-থাকাতে জয়ন্তবাবুর কোনো অসুবিধে হচ্ছিলো?' কথাটাকে সে কোনদিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে তা না-বোঝার ভান ক'রে আমি বললাম, 'ভারি তো একটা বানান নিয়ে কথা, তা-ই অত রেগে যাবে! তুমি কি ছেলেমানুষ?' 'তোমাদের কাছে বানান ব্যাপারটা হালকা হ'তে পারে, আমার কাছে সাংঘাতিক জরুরী।' যে ভাবে ও 'তোমাদের' বললো সেটা আমার পছন্দ হ'লো না, কিন্তু আমি ধৈর্য ধরে বললাম, 'বেশ তো, তুমি তো আর বানান ভুল করছো না—তাহ'লেই হ'লো। অন্যদের উপর মাস্টারি করার তোমার কী দরকার।' 'তাই তো! কোনো দরকার নেই।' —নয়নাংশু চেয়ার ছেড়ে উঠে সুরু মেঝেতে পাইচারি করতে লাগলো, 'কিছুতেই কিছু এসে যায় না—ছাপার ভুল, বানান ভুল, কুৎসিৎত বাংলা—"মেহনতি জনতা"

"মজদুরি সংগ্রাম"—এমনি আরো কত কী—কেউ কোনো ভুল দেখিয়ে দিলে তা মানবে না পর্যন্ত—হাঃ!' 'কিন্তু তুমিই জয়ন্ত রায়কে "কর্মবীর" বলে আকাশে তুলেছিলে—তোলোনি? তুমিই এই "বর্তমান"—এ অনেক টাকার বিজ্ঞাপন দিয়েছো—দাওনি?' 'তখনও আমি পড়িনি পত্রিকাটা—ওঁর কথা শুনে মনে হ'লো ওঁকে আমার সাহায্য করা উচিত।' 'সাহায্য? তার মানে দয়া? তার মানে বিজ্ঞাপনদাতাদের টাকা নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলো।' 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না তো!' নয়নাংশুর চোখ লাল হ'য়ে উঠলো, মাথার চুল টানতে-টানতে আবার বললো, 'এদিকে মতামতেরও কোনো মাথামুণ্ডু নেই—আজ কংগ্রেস, কাল কম্যুনিস্ট, পর্শু স্বতন্ত্র পার্টি যখন যেদিক হাওয়া দিচ্ছে!' এবার আমিও গলা চড়িয়ে বললাম, 'তুমি এখন খুঁজে খুঁজে দোষ ধরছো জয়ন্তবাবুর কেন বলো তো? হয়েছে কী?' নয়নাংশু তার নিজের ভাবনার জের টেনে বললো, 'কাগজের কাটতিটাই আসল কথা। কী ক'রে দুটো পয়সা বেশি আসবে তা ছাড়া আর ভাবনা নেই! বানান ভুলেও কাগজ কেটে যাবে, অতএব থাক বানান ভুল। কোনো মিথ্যে খবর ছাপালে যদি বেশি বিক্রি হয়, তাহ'লে মিথ্যে খবরই ছাপা হোক! একটা সাধারণ বিবেক পর্যন্ত নেই!' 'রেখে দাও তোমার বিবেক!' আমার রক্ত চ'ড়ে গেলো, সে মুহূর্তে যা মুখে এলো তাই বলতে লাগলাম—'আর তুমি যে ডান হাতে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাঁ হাতে নিজের লেখাটি চালিয়ে যাও—সেটাকেই কি বিবেক বলে? উপুরি দুটো পয়সা কামিয়ে নিচ্ছো, এই তো?' 'তার মানে?' তীব্র ভঙ্গিতে আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো নয়নাংশু।'তার মানে? যে-সব কাগজে বিজ্ঞাপন দাও তাদের কাছ থেকে টাকা পাও না। তুমি?' 'কখ্খনো না।' নয়নাংশুর গলা ছিঁড়ে চীৎকার বেরিয়ে এলো—'আমি লিখি, লেখার জন্য সকলেই টাকা পাচ্ছে আজকাল, এর সঙ্গে বিজ্ঞাপনের কোনো সম্পর্ক নেই!' 'তাও তো শুধু আজেবাজে তর্জমা করো—নিজে কিছু লিখতে পারো না?' আমার মুখ থেকে কথাটা বেরোনোমাত্র ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলো নয়নাংশু, জোরে-জোরে তার নিশ্বাস পড়লো কয়েকবার, তারপর হঠাৎ দেখলাম তার মুখটা ভেঙে-চুরে দুমড়ে যাচ্ছে, দু-হাতে মুখ ঢেকে সে ধ্ব'সে পড়লো চেয়ারটার উপর, আমি তার ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার শব্দ শুনলাম।

তখন বোধ হয় ফেব্রুয়ারি মাস, জয়ন্তর সঙ্গে মাস দুই আগে চেনা হয়েছে আমাদের—তখনও তাকে 'মাতাল' নাম দিয়ে তাড়িয়ে দেবার সুযোগ পায়নি অংশু, তখনও আমি আমার মনের চেহারা দেখতে পাইনি, আমার ভালো লাগছে জয়ন্তকে, কিন্তু বুঝিনি কোন পথে এগোচ্ছি, সে যে দিনে-দিনে আমার আরো বেশি ভক্ত হ'য়ে পড়ছে এইটে বেশ উপভোগ করছি মনে মনে, জীবনে একটা নতুন ধরনের স্বাদ পাচ্ছি যাতে আমার লাভ আছে, কিন্তু অন্য কারো কোনো ক্ষতি নেই। এ-ই আমি ভাবছিলুম তখন, কিন্তু সে রাত্রে নয়মাংশুর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে আমার মনের একটা লুকানো কোণে হঠাৎ আলো পড়লো। যুক্তির দিক থেকে তথ্যের দিক থেকে নয়নাংশু হয়তো ঠিকই বলেছিলো—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই—কিন্তু সে যে ঠিক বলেছিলো সেটাই আমি সইতে পারছিলাম না, আমার মনে হচ্ছিলো তার বিদ্যে বেশি ব'লে, টাকা একটু বেশি ব'লে, আর এমুহূর্তে জয়ন্তর উপকার করবার একটা সুযোগ তার আছে বলে, সে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করছে জয়ন্তকে; একজন মানুষ—যার জীবনটা তেমন সুখের নয়, স্ত্রী নেহাত বেচারা গোছের জীব, তার উপর অসুস্থ (আলাপ হবার কয়েকদিনের মধ্যেই এই খবরগুলি সে জানিয়ে দিয়েছিলো আমাদের), যে কোনো বাঁধা চাকরি করে না, দশ হাতে যুদ্ধ ক'রে স্বাধীনভাবে টিকে আছে এই সংসারে—এইরকম একজন মানুষের প্রতি নয়নাংশুর অবহেলার ভঙ্গিতে আমি মর্মান্তিক রেগে গিয়েছিলুম। কিন্তু 'অবহেলিত মানুষটি' যদি জয়ন্ত না-হ'য়ে অন্য কেউ হ'তো? না—আমার রক্তকণিকা নেচে উঠে জবাব দেয়-জয়ন্ত ব'লেই, জয়ন্ত ব'লেই জয়ন্ত ব'লেই।

সে সময়ে আমি কল্পনাও করিনি যে এর কোনো ফলাফল হ'তে পারে, আমি যে একজন পুরুষকে 'জয়' করেছি শুধু ভেবেই খুশী ছিলুম মনে-মনে ভাবিনি এর কোনো প্রতিদান দিতে হবে

কখনো। অংশুর বন্ধুদের সঙ্গে মেলমেশার ফলে আমার ভাবভঙ্গি অনেক বদলে গিয়েছে ততদিনে—বেলেঘাটার 'ভালো বৌ' টিকে প্রায় করুণার চোখে দেখছি, কোনো পুরুষকে আমার প্রতি আকৃষ্ট বুঝলে সেটা উপভোগ করি—উপভোগ করাতে কোনো দোষ আছে ব'লেও ভাবি না; আর নানা জায়গায় নানা মানুষ দেখে এটাও বুঝেছি যে এমন কোনো বিবাহিত মেয়ে নেই একটি অনুগত পুরুষ পেলে যার ভালো না লাগে, নির্দোষ নির্বিধ কোনো ভক্ত পুরুষ। কিন্তু হঠাৎ সেদিন বুঝেছিলাম যে অংশু এতে আহত হচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে, নিজের অজান্তেই, অংশুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা যেন ক'মে গিয়েছিলো, মনে হয়েছিলো ও ভণ্ড, কপট, আমার যে-'ব্যক্তিত্ব' নিয়ে অত বোলচাল ওর সেটা সত্যি কখনো প্রকাশ পেলে ওর সহ্য হয় না।

বিশ্রী লেগেছিল সেদিন, নয়মাংশু যখন কেঁদে ফেললো। আমি ভুল বলেছিলাম, অন্যায় বলেছিলাম—অনুবাদক হিসেবে খানিকটা খ্যাতি আছে ওর, অনেকেই ওর লেখা চেয়ে পাঠায়, ওর নিজের লেখা গল্পও বেরোয় মাঝে মাঝে, আপিশেও ওর সুনাম খুব, চটপট উন্নতি হয়েছে চাকরিতে—সবই জানি আমি। কিন্তু কথাগুলো আমি ইচ্ছে ক'রেই বলেছিলাম, যাতে ওর আঁতে ঘা লাগে, ওর ধরনে যারা ভাবে না তারাই বোকা অথবা মূর্খ, ওর এই দম্ভ যাতে ভেঙে যায়। কিন্তু এই আঘাতে এতটা বেঙে পড়বে তা আমি কল্পনাও করিনি—এর আগে ওকে কাঁদতে দেখিনি কখনো, একজন বয়স্ক পুরুষমানুষের কান্নার সামনে অন্যদের যে কী-রকম অসহায় আর দুর্বল আর বিশ্রী লাগে তাও আমার ধারণা ছিলো না। শুয়ে-শুয়ে ভারি মন খারাপ লাগলো আমার, অনেক রাত্রে উঠে ওর বিছানায় গেলাম—মেয়েদের হাতে ঐ এক বিশল্যকরণী আছে, আর তখনও আমি এই ধারণায় চলছি যে আমি অংশুকে 'ভালোবাসি'—তখনকার মতো শান্তি স্থাপিত হ'লো।

তুমি যে একটা বিপদের মুখে দাঁড়িয়েছো তা তো সেদিন বুঝেছিলে মালতী—কেন সাবধান হওনি? আমি কী করতে পারতাম, আমার হাত তো কিছু ছিলো না। ছিলো না? এদিকে বলছো তুমি একজন স্বাধীন মন-সম্পন্ন মানুষ, অথচ সত্যিকার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাও তোমার স্বামীরই উপর? জয়ন্তকে আঁকড়ে থাকবে তুমি, আর অংশু তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবে, এটা একটু বেশি আশা করা নয় কি? কিন্তু তা-ই তো করেছিলো অংশু, তাকে 'মাতাল' নাম দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। তুমি তাতে খুশী হয়েছিলে? আমার সুখদুঃখে কী এসে যায় অংশুর—সে আজকাল কেমন হ'য়ে গেছে, কত দূরে ঠেলে দিয়েছে আমাকে, সে-কথা আমি কাকে বলি কাকে বোঝাই, কে বুঝবে আমার কথা?

সেই যে জয়ন্ত চ'লে গিয়েও ফিরে এলো, আর অংশু তাতে বাধা দিলে না আপত্তি করলে না, তখন থেকে ধ্বসে পড়তে লাগলো আমার বারো বছরের বিবাহিত জীবন। যেন একটা খেলা খেলছি অংশু আর আমি, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে যাচ্ছি, যথাসম্ভব এড়িয়ে চলি পরস্পরকে, খুব ভদ্রভাবে কথা বলি, পারতপক্ষে কথা বলি না—তবু এক এক সময় হঠাৎ আগুনে জ্ব'লে ওঠে, যে-কোনো তুচ্ছ কারণে বা অকারণে, কখনো বা বুন্নিরই সামনে, দুর্গামণির সামনে, বেরিয়ে আসে বুকের তলার লুকানো বিষ, গোপন আক্রোশ। পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলে অংশু, জয়ন্তর নাম করে না—যদি মাছের ঝোলে ঝাল বেশি হয় বা কোনো বই খুঁজে না পায়, তা' হলে সেই সুতো টেনে টেনে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে আমাকে, কিন্তু আমি তো জানি ওর মনের কথাটা কী, আমার মাথার শির ছিঁড়ে যায়, আমার গলা চ'ড়ে, আমি ওকে গালিগালাজ করি, ওর ঠোঁটের কোণ বেঁকে যায় কুৎসিত হয়ে, তারপর হঠাৎ বুক-চাপা স্তব্ধতা নামে বাড়িতে। কুৎসিত, কর্কশ সে সব কলহ! এর আগে তবু শরীরে কিছু সান্ত্বনা ছিলো, কিন্তু হায়, সেই সম্বলটুকুও আর নেই আমাদের, সেই সময় থেকেই এমন হ'য়ে উঠলো যে অংশুর শরীরটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। অংশু মাঝে মাঝে চেষ্টা করে না তা নয়—অতি কাতর অতি করুণ সে-সব চেষ্টা, আমি ওকে রূঢ়ভাবে ফিরিয়ে দিই, কখনো হয়তো এমন হয় যে আমি সাড়াও দিই না স'রেও যাই না, অত করে তৈরি করি নিজেকে,

প্রাণপণে চেপে রাখি আমার বিতৃষ্ণা—আমার ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ঠাণ্ডা, পাথর, আমি নিজেই বুঝতে পারি যে আমি চোখ বুজে মিনিট গুনছি, আর হয়তো সেইজন্যেই নয়নাংশুও নেতিয়ে যায় একটু পরেই, আর ব্যাপারটা চুকে যাওয়ামাত্র আমি হাঁপ ছেড়ে নিজের বিছানায় উঠে আসি। সব বুঝে—সব বুঝেও আমি কোনো সমাধানের কথা ভাবি না—আমি জানি কোনো সমাধান নেই এর; আমার পক্ষে জয়ন্তকে বলা, 'তুমি আর এসো না' বা অংশুকে বলা, 'এসো আমরা কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাই-' এই সবই নাটুকে, অবাস্তব, কোনোটাই কোনো কাজের কথা নয়। তাছাড়া—কেনই বা জয়ন্তকে ছাড়বো আমি, যখন তারই জন্য আমার জীবনে যেন নতুন ক'রে জোয়ার এসেছে?

—আমি চেষ্টা করিনি তা নয়, যুদ্ধ করিনি তা নয়, কত রাত্রে মনে মনে বলেছি, 'আমি অংশুর কাছে ক্ষমা চাইবো, ওর পায়ে পড়বো; ও কষ্ট পাচ্ছে—কার দোষে জানি না—সেই কষ্ট আমি মুছে নেবো।'—কিন্তু তক্ষুণি অন্য একজনের চশমা-পরা চোখ ভেসে উঠেছে আমার সামনে, আর নয়নাংশু একটা বিন্দু হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে, আমার মনের দরজা বন্ধ হ'য়ে গিয়ে আটকে দিয়েছে নয়মাংশুর পথ। তারপর ভেবেছি : আমি তো অংশুর সংসার দেখছি, তার মেয়েকে মানুষ করছি, বাজারের হিসেব লিখছি, ধোবাবাড়িতে কাপড় পাঠাচ্ছি—তার সুখের দিকে আরামের দিকে আমার তো মনোযোগের অভাব নেই—এই সব-কিছুর মজুরী হিসেবে আমি এটুকু চাইতে পারি না যে আমি কোথাও কিছুটা ব্যক্তিগত তৃপ্তি খুঁজে নেবো। বিয়ের পরে আমরা তো বাবাকে ভুলে যাই না, দাদাকে ভুলে যাই না, যদি অন্য কোনো পুরুষ আমাকে এমন কিছু দিতে পারে যা স্বামী পারে না, বা দিতে চায় না, তাহ'লে কেন আকাশ ভেঙে পড়বে? আমি অন্যায় ভাবছি? আমার অধর্ম হচ্ছে? কিন্তু নয়নাংশু যে এই বাড়িটাকে বিষ ক'রে তুলেছে তা কি কেউ দেখছে না? মাঝে-মাঝে—সাধারণত কোনো বিস্ফোরণের পরে—মাঝে-মাঝে এমন হয় সে কুঁকড়ে গুটিয়ে যায় নিজের মধ্যে, আপিশ থেকে দেরি ক'রে ফেরে, আমার সঙ্গে প্রায় চোখাচোখি করে না, বাড়ি থেকে খামকা বেরিয়ে যায়, সে আর আমি সহজভাবে কথাবার্তা বলি শুধু বুন্নি কাছাকাছি থাকলে—তাও আসলে সহজভাবে নয়, বাড়িতে তার গলার আওয়াজ বা এক-আধটু হাসি শোনা যায় শুধু তার বন্ধুরা আসে যখন (এককালে তার উচ্চহাসি পাশের তিনটে ফ্ল্যাট থেকে শোনা যেতো—আর বন্ধুরাও বেশি আসে না আজকাল। আমি বুঝতে পারি জয়ন্তর উপর তারাও বিরূপ, এ-বাড়িতে সে অতটা জুড়েছে ব'লে তাকে হিংসে করছে অন্যেরা—আমি, একটা সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ে, নয়নাংশুর মতো মন-গুমরোনা নই—আমার কি দম আটকে আসে না এই আবহাওয়ায়? আবার কখনো স্বাভাবিক ভাবে দিন কাটে, মনে হয় যেন কোথাও কোনো গোলমাল নেই, কিন্তু আমরা দু-জনেই বুঝি সেই স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিক, বানানো, তার পিছনে আছে এতে বেশি মানসিক শ্রম যে বেশিদিন সেটা বজায় রাখা অসম্ভব। সারা জগৎসংসারের উপর আমার রাগ হয় তখন—মনে হয় জয়ন্ত ছাড়া আমার কেউ নেই, আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করেছে, সে আমাকে ফিরে পাবার একটুও চেষ্ট করছে না, সে আমাকে ঠেলে দিচ্ছে—ঠেলে দিচ্ছে—এই যেখানে এখন আমি পৌঁছেছি, সেখানে। আমি হাজার বার বলবো যা হয়েছে তারই দোষে হয়েছে—তারই দোষে—তারই অবিবেচনায়, অক্ষমতায়—কেন-কেন সে আমাকে ছিনিয়ে এনেছিলো নিরাপদ যৌথ পরিবার থেকে, ওর বন্ধুদের মধ্যে আমাকে টেনে এনেছিলো কেন, কেন সে আমাকে শিখিয়েছিলো যে 'ভালোবাসা'র উপরে সত্য নেই (যদিও কেউ জানে না, এই 'ভালোবাসা' ব্যাপারটা কী), কেন প্রথম থেকে সব বুঝেও-সে চুপ ক'রে ছিলো, প্রশ্রয় দিয়েছিলো, কেন কখনো জোর করেনি—শুধু মাঝে-মাঝে কথার ইস্কুরুপ চালিয়েছে আমার উপর—কেন সময় থাকতে থেঁতলে পিষে দেয়নি ব্যাপারটাকে, কেন—যখন অশান্তির ডিগ্রি চ'ড়ে যাচ্ছে—তখনও জয়ন্তর কাছে এক ধরনের 'ভালোত্বে'র ভড়ং বজায় রেখেছিলো? তার কাছে কী স্ত্রীর চাইতে বেশি হ'লো

চক্ষুলজ্জা, সুখের চাইতে ভদ্রতা বড়ো হ'লো? তবে তো বলতে হয় আমার জন্যে ওর সত্যিকার দরদ নেই, আমি শুধু ওর শরীরের খিদে মেটাবার উপায়, শুধু আরামের যন্ত্র—আর সেটা বুঝে ফেলার পরেও আমাকে ওর লক্ষ্মী সীতা বৌ হ'য়ে কি থাকতেই হবে? না—আমি চাই প্রেম—সব অর্থে প্রেম—আমি চাই পূজা স্তুতি আনুগত্য, চাই নিজেকে নিজের চেয়ে বড়ো ক'রে দেখতে—আমি তো নয়নাংশুর মতো বই পড়া ভাবুনে নই যে কতকগুলো ধারণার মোহে ফাঁকি দেবো অন্যকে আর নিজেকে? আমি কী করতে পারি—আমার কী দোষ—আমার জন্যে যে-মানুষটা পাগল হ'য়ে আছে তাকে আমি কেমন করে ফিরিয়ে দেবো, অতটা জোর একলা আমার কাছে কেন আশা করা হবে—আমি তো মানুষ, আমি তো মেয়ে, আমারও তো রক্তমাংসের শরীর। আর যদি বা আমারই দোষ হয়—না হয় মানছি আমারই দোষ, নয়নাংশু আমার ভালো ছাড়া কিছু করতে চায়নি, মানছি সে আমাকে ভালোবাসে—অন্তত সে 'ভালোবাসা' বলতে যা বোঝে সেটা তার আছে আমার জন্য—কিন্তু তার ভালোবাসার ধরনটা আমার পছন্দ হয় না; মানছি এটা আমারই —কী বলে গিয়ে—বিশ্বাসঘাতকতা—যদিও ওসব গালভরা বুলি শুনলে কার না হাসি পাবে আজকাল? বেশ, সব মানছি আমি, কিন্তু এর পর—এর পর কী? বিশ্বাসঘাতিনীকে শিক্ষা দিতে চাও, নয়নাংশু? বেশ তো, এসো আমার প্রাপ্য শাস্তি দাও আমাকে, আমি টু শব্দটি করবো না। শোনো নয়নাংশু—আমি ডাকছি তোমাকে, তোমাকে বলছি, উঠে এসো, তুমি তো বুঝেছো তোমার স্ত্রী অসতী, এখন তুমি যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারো, তাকে বের ক'রে দাও রাস্তায়, গলা টিপে মেরে ফ্যালো তাকে, বসিয়ে দাও ছোরা তার বুকের মধ্যে।—প্রতিশোধ নাও। প্রতিশোধ নাও, নয়নাংশু, প্রমাণ করো তোমার স্বামীত্ব। না—ওসব আগডুম-বাগডুম বলে লাভ নেই, ও-রকম আর হয় না আজকাল! তাহ'লে কী হবে? ডিভোর্স? না—ও-সব বড্ড গোলমেলে ব্যাপার। আর তাছাড়া—তাছাড়া—বুন্নি আছে, বুন্নি, আমার বুন্নি, আমার সোনা! বুন্নিকে আমি ছাড়বো না, কিছুতেই না, ওর জন্য সব করবো আমি, নয়নাংশুর পা জড়িয়ে বলবো, 'আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না, শুধু থাকতে দাও এখানে—আর নয়তো আলাদা হয়ে যাবো বুন্নিকে নিয়ে, চাকরি ক'রে চালাবো; আমার গয়না আছে, আমি বি. এ. পাশ করেছিলাম—নয়নাংশু বেশি তেজ দেখালে আমিও জবাব দিতে পারি। শুধু বুন্নিকে আমার চাই, বুন্নিকে আমার চাই! কিন্তু ও যদি দিতে না চায়? কে জানে কী ভাবছে নয়নাংশু। আমি কি ওকে ডেকে তুলে বলবো, 'শোনো, আমি এই-এই করেছি, তুমি এখন কী করবে বলো।' ন্যাকামি কোরো না, মালতী, বোকামি কোরো না। না কি বলবো—'অংশু, তোমার বিখ্যাত "ভালোবাসা" বাজে, ঝুটা মাল, আসল হ'লো সংসার। তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলো আমরা স্বামী-স্ত্রী—এখনো আছি, এক বিছানায় শুতে হয় না, একসঙ্গে বেরোতে হয় না, বেশি কথাবার্তা বলারও দরকার নেই—এমনি কেটে যাক না আমাদের সারা জীবন, যেমন ক'রে অসংখ্য মানুষের কেটে যায়।' তা কি সম্ভব? তা কি সম্ভব নয়? তাহ'লে? তাহ'লে কিছু ভাবনার নেই, কী এমন হয়েছে যা নিয়ে এত ভাবছো, দেখছো তো বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়েনি তোমার মাথার উপর, বজ্রপাত হয়নি, কাল সকালে সূর্য উঠবে—সব ঠিক আছে। চুপ ক'রে থাকো, কেটে যেতে দাও দিনের পর দিন—ঘটনাচক্রে কিছু একটা সমাধান হবেই, অথবা হবে না, ও-সব ভাগ্যের হাতে, সময়ের হাতে ছেড়ে দেয়াই ভালো। যদি নয়নাংশু এখন উঠে এসে জানতে চায় সে যা সন্দেহ করছে তা সত্য কিনা, যদি হাজারবার জিগেস করে আমি তা'হলে হাজারবার বলবো—'ভগবান সাক্ষী, আমি বুন্নির মাথা ছুঁয়ে বলছি তুমি যা ভাবছো তা ভুল, মিথ্যে!'—তারপর ভোর হবে—আবার একটা দিন—দিনের পর দিন—যার সঙ্গে আমার শরীর মেলে না মন মেলে না তার সঙ্গে, লোক-দেখানোর জন্য তার সঙ্গে, শুকনো একটা কাঠামো আঁকড়ে একসঙ্গে—আরো কত কাল কত বছর বাঁচতে হবে—কেমন ক'রে বেঁচে থাকবো হাসবো কথা বলবো নিশ্বাস নেবো—হা ভগবান, কেন এই শাস্তি দিলে আমাকে!

চার

কোনো—কোনো কথা বাংলা ভাষায় বলা যায় না। বিদেশী গল্প অনুবাদ করার সময় বার-বার আমি থমকে গিয়েছি যখনই কেউ কাউকে বলেছে—'I love you' বা 'Do you love me?' বাধ্য হয়ে লিখেছি, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি', 'তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?' কিন্তু নিজের কানেই খাপছাড়া শুনিয়েছে, বানানো, কৃত্রিম—ওটা আমাদের কাছে বইয়ের ভাষা, ভাবনার ভাষা—মুখের নয়। আমরা অনেক কিছুই ভঙ্গি দিয়ে বোঝাই, 'গুড্ মর্নিং' না ব'লে একটু হাসি শুধু, আমাদের প্রেমের প্রকাশ চোখে-চোখে, হাতের ছোঁওয়ায়, সাধারণ কথার মধ্যে লুকিয়ে রাখা গভীরতর কথায়। আর যে দেশে এখনো অসংখ্য লোক পাতানো বিয়ে করছে, আর সেই বিয়েটাকে মেনে নিচ্ছে অবশিষ্ট জীবনের মতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব'লে, সে-দেশে 'তুমি কি আমাকে ভালোবাসা'র মতো উৎকট প্রশ্ন মুখে আনার উপলক্ষ ঘটে শুধু একমুঠো দুর্ভাগ্য মানুষের জীবনে।

আমি সেই দুর্ভাগাদের একজন, ঠিক ঐ প্রশ্নটি সম্প্রতি আমাকে কয়েকবার মুখে আনতে হয়েছে। কিন্তু বলবার ভাষা ঠিক খুঁজে পাইনি—এত শক্ত ওসব কথা বাংলায় বলা। 'মালতী, তুমি কি আমাকে আর ভালোবাসো না?' বাজে, বিশ্রী, নাটুকে, কিন্তু ঢোঁক গিলে ঐ কথাগুলোই আমি মুখে এনেছিলাম বা ওরই কাছাকাছি কিন্তু-একবার নয়, অনেকবার। মালতী প্রথমে বলেছে, 'এ আবার কী-রকম বোকার মতো প্রশ্ন!' কিন্তু আমি যখন অনেকদূর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গিয়েছি প্রশ্নটাকে তখন মালতী ঝাঁঝালো গলায় ব'লে উঠেছে 'হ্যাঁ, বাসি, বাসি! হলো? যাও এবার নিজের কাজ করো, আর গোয়েন্দার মতো জেরা করো না।'

হায়, ভালোবাসো! যেন তা মুখের কথার উপর নির্ভর করে—যেন তা চোখে ভেসে ওঠে না, ধরা পড়ে না গালের রঙে, হাতের নড়াচড়ায়, এমন কি পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকার ধরনে, নিচু হ'য়ে চা ঢেলে দেবার ভঙ্গিটুকুতে পর্যন্ত! তা আলোর মতো সহজ, রোদের মতো নির্ভুল—সেখানে কোনো তর্ক নেই, তা চিনে নিতে এক মুহূর্ত দেরি হয় না। এই কথাটাই আমি বলার চেষ্টা করেছিলাম মালতীকে অনেক কষ্টে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে-তুমি যদি সত্যি আমাকে ভালোবাসো আমি কেন তা অনুভব করি না? কেন করো না তা আমি কী ক'রে বলবো! ব্যস, এর উপর আর কথা নেই। একটা দেয়াল, বোবা দেয়াল, মাথা ঠুকলে শুধু মাথা ঠোকার প্রতিধ্বনি বেরোবে।

জয়ন্ত তখন মাসখানেক ধ'রে আসছে এ-বাড়িতে—ওরই মধ্যে কায়েমি হয়ে বসেছে—এক রাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। জয়ন্ত, মালতী, আমি—আমরা তিনজনে বাস্-এর জন্য দাঁড়িয়ে আছি—ভিড়ের জন্য দুটো বাস ছেড়ে দিতে হ'লো, আর-একটা এসে দাঁড়াতেই মালতী উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি, তারপর জয়ন্ত, কিন্তু আমি হাতল ধরা মাত্র ছেড়ে দিলো বাস্টা, জয়ন্ত হাত নেড়ে কেমন একটু হাসলো আমার দিকে—আমি তক্ষুণি বুঝলাম ওটাই ওরা চেয়েছিলো, মালতী আমাকে ছেড়ে চ'লে গেলো জয়ন্তর সঙ্গে—মালতী আমাকে ছেড়ে চ'লে গেলো। আমি ছুটলাম সেই বাস্-এর পিছনে, কিন্তু প্রকাণ্ড দোতলা বাসটা মুহূর্তে হারিয়ে গেলো আমার চোখ থেকে। আমি স্বপ্নের মধ্যে বুক-ভাঙা একটা কষ্ট অনুভব করলাম যেন আমার সর্বস্ব হারিয়ে গেলো,—যেন আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড আর নেই, ওরকম একটা বিরাট ক্ষতির অনুভূতি আর কখানো হয়নি আমার—সেই কষ্ট নিয়েই জেগে উঠলাম অন্ধকারে। অন্ধের তো হাত বাড়িয়ে দিলাম মালতীর দিকে (তখনও আমরা জোড়া খাটে শুচ্ছি), আমার হাত তাকে স্পর্শ করলো। তবু আমি আশ্বস্ত

হ'তে পারলাম না, ঠেলা দিয়ে ডেকে বললাম, 'মালতী, শোনো।' ঘুমের গলায় জবাব এলো 'কী হয়েছে?' আমি বিছানায় উঠে ব'সে বললাম, 'আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখলাম জয়ন্তবাবু তোমাকে নিয়ে পালিয়ে গেছেন।' 'সে আবার কী!' আর—কিছু বললো না মালতী, আমি অন্ধকারে চোখ সরু করে তার চোখ দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে উল্টো দিকে পাশ ফিরে বললে, 'ঘুমোও', তারপর আর তার সাড়াশব্দ পেলাম না, খানিকক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়লাম। জানি না মালতীর মনে আছে কিনা, কিন্তু আমি এই স্বপ্নটা এখনো ভুলিনি, ভুলবো না কোনোদিন। এই স্বপ্নের কথা ভাবলে এখনো ভীষণ কষ্ট হয় আমার, এখনো মনে হয় আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড আর নেই, সে তুলনায় আজ কোনো কষ্টই পাচ্ছি না, আজ আর কিছু এসে যায় না কিছুতেই।

মালতী ভালোবাসে জয়ন্তকে, এই কথাটা ও নিজে বোঝার আগেই আমি বুঝেছিলাম! বুঝেছিলাম ওর চোখের দিকে তাকিয়ে, ও যখন জয়ন্তর দিকে তাকায় সেই তাকানোর দিকে তাকিয়ে। ভেজা-ভেজা চোখ, যেন দূরের কিছু দেখার চেষ্টায় ঈষৎ সংকুচিত, মাঝে-মাঝে আধো বুজে আসে যেন ঘুম পেয়েছে। ওর ঐ দৃষ্টি আমার চেনা; বিয়ের আগে, বিয়ের পরেও কয়েক মাস, ঠিক অমনি করেই আমার দিকে ও তাকাতো—বা আমার দিকে তাকালে ওর দৃষ্টি হয়ে যেতো ওরকম—ঐ রকমই সজল দেখাতো ওর দাঁত হাসতে গেলে বা কথা বলতে গেলে। স্পষ্ট—সব আমার কাছে, যেন প্রকাণ্ড ব্যানার দিয়েছে কাগজে, যেন আমার ঘরের দেয়ালে বিরাটা হরফের প্ল্যাকার্ড আঁকা। কিন্তু মালতী নিজেকে দেখতে পায় না, তার নিজের চোখ অচেনা তার কাছে, তাই আমি প্রথম কিছুদিন ওকে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলাম—যেন নিশ্চিন্তে, যেন ব্যাপারটায় আমার কোনো অংশ নেই। কিন্তু আস্তে আস্তে দেখলাম ওর চোখের সরলতা মুছে যাচ্ছে, দেখলাম সূক্ষ্ম রেখা মাঝে মাঝে ওর কপালে, জয়ন্তর সঙ্গে কথা বলার সময় ঠোঁটের কোণ কেমন বেঁকে যায় একটু, আমার খাওয়া-দাওয়া জামাকাপড়ের দিকে হঠাৎ বড্ড বেশি মনোযোগী হয়ে উঠলো। এতদিন ও ভেবেছিলো ও শুধু জয়ন্তর পুজো নিচ্ছে, বিনিময়ে কিছুই দিচ্ছে না বা দিতে হবে না, কিন্তু এবারে ওর নিজের মনের চেহারা আর লুকানো রইলো না ওর কাছে, আর তখন থেকেই শুরু হ'লো চলতে লাগলো—এই ঝাউতলা রোডের দেয়ালের মধ্যে, এই সুন্দর ক'রে সাজানো ফ্ল্যাটে, দিনের পর দিন-একটা যুদ্ধ!

'ঠাণ্ডা' যুদ্ধ, ঘোষিত হয়নি, চোখে-চোখে যুদ্ধ, পা ফেলার যুদ্ধ, কথার তলে লুকিয়ে-থাকা কথার তীরন্দাজি। অনেক কথা আছে যা বলা যায় না—বাংলায় না, অন্য কোনো ভাষাতেও না—যা বলার জন্য অন্য কিছু বলতে হয় আমাদের, কিংবা যা বলা না—হলেও সবাই বুঝে নেয়। একবার এক ধোপা ভারি মুশকিল বাধিয়েছিলো; মালতীর দু-খানা সিল্কের শাড়ি নিয়ে আর ফেরত দিচ্ছে না সে—একমাস, দেড়মাস, প্রায় দু-মাস কেটে গেলো। মালতী দু-বার কেষ্টকে পাঠালো—একবার শোনা গেল জগাই ধোপা জ্বরে ভুগছে, আর একবার তার দেখা পাওয়া গেলো না। 'চাকর দিয়ে কি আর সব কাজ হয়! বাড়ির কর্তা একেবারে ন'ড়ে বসবে না—আর শাড়ি দুটো খোয়া গেলেই বা তার কী!' মালতীর এ-সব স্বগতোক্তি কয়েকবার কানে আসার পর বললুম, 'কেষ্টকেই আর একবার পাঠিয়ে দ্যাখো না।' এবারে কেষ্ট ফিরে এসে বললো—কালই আসবে জগাই ধোপা, কিন্তু তার পরেও যখন দশ-বারোদিন কেটে গেলো তখন একদিন সন্ধেবেলা মালতী একটি বক্তৃতা দিলো ধোপাদের অসভ্যতা বিষয়ে—জয়ন্ত ছিলো, আরো অনেকে—কেমন নির্বিবাদে তারা কাপড় হারায়, ছেঁড়ে, আটকে রাখে, নিজেরা ব্যবহার করে, জমিয়ে রেখে পচিয়ে দেয়, ভালো জিনিসগুলো ভাড়া খাটায়, ইস্ত্রি করতে গিয়ে পুড়িয়ে ফ্যালে, অথচ পাওনা আদায়ের সময় এক ফুটো পয়সা কম নেবে না—এ-সব কথা সাত কাহন হ'লো সেদিন, অন্যেরাও যোগ দিলো মাঝে-মাঝে, দেখা গেলো অনেকেই ধোপার অত্যাচারের ভুক্তভোগী। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলে, 'ব্যাটাচ্ছেলের নাম কী? যে আপনার শাড়ি নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না?' 'জগাই।' 'জগাই

ধোপা—কোথায় থাকে?' 'ঢাকুরেতে।' আর কিছু বললো না জয়ন্ত, অতক্ষণ ধ'রে ধোপাচর্চা শুনে বিরক্ত লাগছিলো আমার, এই সুযোগে কথা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম, 'আচ্ছা চণ্ডীদাসের রামী কি সত্যি ধোপানি ছিলো?'

পরের দিন ছিলো রোববার, বেলা প্রায় দুটো, আমরা একটু আগে খেয়ে উঠেছি, হঠাৎ শীত চ'লে গিয়ে গরম পড়েছে কলকাতায়, পাখা চলছে, জানালা বন্ধ, মালতী পাটি পেতে কয়েকটা পত্রিকা নিয়ে শুয়ে পড়েছে, আমি হেমিংওয়ের একটা গল্প তর্জমা করতে বসেছি, এমন সময় বসার ঘরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেলো। প্রথমে মালতী, তারপর আমি উঠে এলুম। জয়ন্ত এসেছে, সঙ্গে একটি কালোকেলো লোক যাকে আমি ঠিক চিনতে পারলুম না, কিন্তু অনুমানে বুঝলুম সেই জগাই ধোপা। জয়ন্ত বলল, 'মিসে মুখার্জি, এই নিন আপনার শাড়ি। ঠিক আছে তো?' তারপর জাগাইয়ের কাঁধে একটা গুঁতো দিয়ে বললে, 'দ্যাখ তোর সামনে কে!' মালতীর দিকে তাকিয়ে জগাই বিড়বিড় ক'রে কী বললো বোঝা গেলো না—বোঝার কোন দরকার ছিলো না অবশ্য—আমি দেখলুম মালতী কেমন একদৃষ্টিতে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে আছে, জয়ন্তর চোখ লাল, ঘামছে দরদর ক'রে—এক পলকে বুঝে নেওয়া যায় কত হাঙ্গামা ক'রে এই শাড়ি সে উদ্ধার করেছে, শুধু শাড়ি নয়, অপরাধী ধোপাকেও সশরীরে এনে উপস্থিত করেছে মালতীর কাছে। 'তাকিয়ে দ্যাখ কে এসেছে!' যেন রানীর সামনে চোর ধ'রে আনা হয়েছে বিচারের জন্য, মালতী যেন জগাই ধোপার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী, যেন আশা করা হচ্ছে জগাই মালতীর পায়ে পড়ে হাঁউমাউ ক'রে কেঁদে উঠবে—আর মালতী, সেও দিব্য রানীর পার্টের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে, যেন ধ'রে নিচ্ছে অধীন জয়ন্ত তার জন্য না-করতে পারে এমন কাজ নেই, যেন ইচ্ছে করলে এই ধোপার অস্তিত্বসুদ্ধ সে মুছে দিতে পারে এখন—এই সবই আমি এক মুহূর্তে দেখে নিলাম, বুঝে নিলাম। মালতীর সেদিনকার চেহারাটা গাঁথা হ'য়ে আছে আমার মনে—তার পিঠের চুল ছিলো খোলা, পরনে টুকটুকে লাল পাড়ের শাড়ি, পানের রঙে টুকটুকে ঠোঁট, দাঁড়িয়েছে একটি দয়া আর গর্ব মেশানো সুন্দর ভঙ্গিতে, আর তার চোখ—তার চোখ জয়ন্তর মুখ থেকে নড়ছে না, আর তার গালে ছড়িয়ে পড়েছে এক গভীরতর আভা, তার রক্ত চঞ্চল হ'য়ে সারা মুখে আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে—লাল, উজ্জ্বল, বিজয়ী।

আর—একদিন আপিশ থেকে ফিরে দেখি বুন্নির জ্বর, জয়ন্ত তার মাথা টিপে দিচ্ছে শিয়রে ব'সে। আমি ঘরে ঢোকামাত্র মালতী বললো, 'স্কুল থেকেই জ্বর নিয়ে ফিরেছে, গলাব্যাথাও আছে—একবার কুমুদ ডাক্তারকে ডেকে আনবে নাকি?' আমি বললুম, 'পাশের ফ্ল্যাট থেকে ফোন ক'রে দাও না।' 'করেছিলুম—ডাক্তার ছিলেন, না তখন আর অন্যের বাড়ি থেকে বার-বার ফোন করা যায় না তো।' 'কুমুদ ডাক্তার সাতটার আগে চেম্বারে আসেন না, আমি চট ক'রে স্নানটা সেরে নিই।' বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি জয়ন্ত নেই। 'জয়ন্তবাবু কোথায় গেলেন?' এর উত্তরে মালতী বললো, 'তাঁর শুয়ে-ব'সে দিন কাটে না তিনি কাজের লোক, ডাক্তার ডাকাতে গেলেন।' ঠাণ্ডা গলায় বললো এই কথাটা—রাগের ভাবে নয়, খুব সাধারণ সুরে। সে-মুহূর্তে কিছু-একটা ঘটে গেলো আমার মধ্যে—অন্ধ, রাগে দুঃখে আক্রোশে অন্ধ, আমার মগজে একটা বিষাক্ত পোকা বনবন ক'রে ঘুরতে লাগলো 'তুমি শুয়ে-ব'সে দিন কাটাও, তুমি শুয়ে-ব'সে দিন কাটাও!' আমি নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম, বড়োরাস্তায় এসে হঠাৎ ট্রামে উঠে পড়লাম; নামলাম গড়িয়াহাটের মোড়ে, একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেলাম এক পেয়ালা, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভিড় দেখলাম, হাঁটতে লাগলাম লেকের দিকে, ফিরে এলাম, সিগারেট আর দেশলাই কিনলাম, লেকে এসে একটা বেঞ্চিতে ব'সে রইলাম খানিকক্ষণ, আবার আস্তে-আস্তে গড়িয়াহাটের মোড়ে এসে বাড়িমুখো ট্রাম ধরলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ক্লান্ত লাগছিলো আমার, অসম্ভব ক্লান্ত, বসার ঘরের দরজার কাছে দম নেবার জন্য দাঁড়ালাম একটু। ভিতর থেকে চাপা গলার আওয়াজ আসছে, কোনো

কথা শোনা যাচ্ছে না, শুধু গলার আওয়াজ—কোনো বিষাক্ত পোকার উড়ে-চলা খসখসানির মতো, সূক্ষ্ম, খুব মৃদু, অস্পষ্ট, মাঝে মাঝে।

আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা দুজনেই হঠাৎ চুপ ক'রে গেলো।

জয়ন্ত ফুর্তির সুরে বললো 'এই যে মশাই—হঠাৎ কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? কিছু ভাববেন না—আমি একেবারে বাড়ি থেকে ধ'রে এনেছিলাম ডাক্তারকে, বুন্নি ভালো আছে, ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো এইমাত্র।'

ভিতর থেকে অস্ফুট আওয়াজ এলো, 'মা!'

'এই যে আমি!' মালতী উঠে বুন্নির কাছে চ'লে গেলো, একটু পরে জয়ন্তও উঠলো, শোবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললো, 'মিসেস মুখার্জি, আমি চলি আজ। এগারোটার সময় ওষুধটা আর-একবার দেবেন কিন্তু।' আমার প্রায় ইচ্ছে হ'লো জয়ন্তকে আরো খানিকক্ষণ ধ'রে রাখি, প্রায় ভয় করলো ভাবতে যে এই ফ্ল্যাটটার মধ্যে মালতী আর আমি একা থাকবো সমস্ত রাত। ভাগ্যিশ বুন্নির আজ অসুখ—কোনো কথাবার্তা না-বলার একটা অছিলা আছে অন্তত। এর কয়েকদিন পরে মালতী আমাদে খাট দুটোকে আলাদা করে দিয়ে শোবার ঘরটা একটু অন্যভাবে সাজালো, আমি কোনো উচ্চবাচ্য করলুম না।

এটা সেই সময়, যখন পর্যন্ত আমি চেষ্টা করছি মালতীর সঙ্গে 'বোঝাপড়া' করতে। খুব কষ্টের কাজ, দু-পক্ষেই কষ্টের, কেউ কারো কথা বোঝে না, বলতে গিয়ে কথাগুলো ভেঙে যায়, বা ফেরত আসে অচল সিকি-আধুলির মতো। বোবা দেয়াল, ঠাণ্ডা দেয়াল, মাথা ঠুকলো শুধু মাথা ঠোকার প্রতিধ্বনি বেরোয়। বাঁধা বুলি মালতীর মুখে 'এই যদি তোমার মনের কথা তাহ'লে জয়ন্তবাবুকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেই পারো! দাও না কেন?' 'দিই না এইজন্য যে তাতে আমার কোন লাভ নেই, তাতে আমি ফিরে পাবো না তোমাকে, কেননা মানুষের মনই সব, ইচ্ছেটাই আসল, সেটাকে কাজে খাটানো গেলো কি গেলো না তা অবান্তর। ধর জয়ন্তকে আমি তাড়িয়ে দিলুম, তারপর তুমি জয়ন্তর অভাবে আধমরা হ'য়ে থাকলে তাতে আমার লাভ কী, বলো।' এ-সব কথা মুখে আনা যায় না, মনে মনে গুছিয়ে চমৎকার ভাবা যায়, চিঠিতে লেখা যায় হয়তো, কিন্তু মুখে বলা যায় না—অন্তত নিজের স্ত্রীকে বলা যায় না, ব'লে কোনো লাভও নেই কেননা কথাটা এতই সত্য যে মালতীও পারবে না প্রতিবাদ করতে, আর পারবে না ব'লেই ওর আক্রোশ আরো বেড়ে যাবে আমার উপর। হয়তো শেষ পর্যন্ত না-শুনেই ব'লে উঠবে—যেমন মাঝে-মাঝেই বলে 'আসল কথা কী জানো? তুমি ভীষণ হিংসুক, ভীষণ স্বার্থপর, তুমি চাও সকলে সব সময় তোমার মন যুগিয়ে চলবে—আমি তো আমি, বুন্নির দিকেও কেউ একটু বেশি মনোযোগ দিলে তোমার তা ভালো লাগে না!'

ঐ আর-এক কথা তোমার মুখে, মালতী হিংসে—যেন সেটা আমারই একচেটে সম্পত্তি বা স্বামীদের বা পুরুষজাতির কোনো বৈশিষ্ট্য—দাড়ি-গোঁফের মতো কিছু-একটা, যা তোমার বা মেয়েদের মধ্যে কখনোই বর্তাবে না। মনে আছে, বিয়ের পরের বছর দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়ে দরিয়ার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমাদের? পাঞ্জাবী মেয়ে, চৌদ্দ বছরে আঠারোর মতো, দেখায় চমৎকার চেহারা, চমৎকার ইংরিজি বলে—আমাদের ফেরার দিন সে আমাদের সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত এলো, আমি তারই সঙ্গে কথা বললুম হাঁটতে-হাঁটতে, আমার ভালো লাগছিলো ওর সঙ্গটা, অনভিজ্ঞতাবশত বুঝতে পারিনি যে তুমি তাতে রেগে যাচ্ছো। আর সেইজন্যে ট্রেনে তুমি সারা রাত কথা বললে না আমার সঙ্গে, তোমার মুখ আঁচ-প'ড়ে-যাওয়া উনুনের মতো কালো আর বোবা হ'য়ে রইলো, আমি সেই নির্জন কূপেতে অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রেও তোমার রাগ ভাঙাতে পারলাম না—মনে আছে? অথচ কে এই দরিয়া যার জন্যে সেই ট্রেনের সুন্দর রাত্রিটাকে, আর দার্জিলিঙের সুন্দর স্মৃতিকে, তুমি বিষ ক'রে দিয়েছিলে? কী বলে একে? স্বামী হ'লে হিংসে, আর

স্ত্রী হ'লে সুবুদ্ধি, তাই না? 'আমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু পাছে তোমাকে কেউ কিছু খারাপ ভাবে'—তা-ই না? একবার, তোমার বাবার এলাহাবাদে গিয়ে স্টোক হ'লো, তুমি টেলিগ্রাম পেয়ে চ'লে গিয়েছো—আমি একা বাড়িতে, হঠাৎ সন্ধেবেলায় ফ্ল্যাটের দরজার টোকা পড়লো। একটি মেয়ে ঘরে ঢুকে বললে, 'আমাকে বোধহয় চিনতে পারছেন না—আমি নীলিমা।' আমার মনে পড়লো মেয়েটি তোমার কী-রকমের আত্মীয়, তোমার বাপের বাড়িতে কয়েকবার দেখেছিলাম তাকে, তুমি বলেছিলে বিয়ের পর থেকেই তার স্বামীর সঙ্গে গোলমাল চলছে, আরো যেন কী কী বলেছিলে ঠিক মনে পড়লো না! আমি আমতা-আমতা করে বললুম, 'মালতী এখানে নেই—এলাহাদে গেছে-তা আপনার কি কোন—' 'হ্যাঁ, আমার একটু দরকার ছিলো—বিশেষ দরকার—আমি একটা কাজে কলকাতায় এসেছিলাম। কালই বাবার কাছে গোহাটিতে যাবো—আমার কলকাতায় কোন থাকার জায়গা নেই এখন, আক রাতটা যদি—যদি এখানে থাকতে দেন আমাকে।' কথাটা শোনামাত্র আমার মনে প'ড়ে গেলো তুমি বলেছিলে নীলিমা 'খারাপ মেয়ে', বিয়ের আগে অনেক ছেলের মুণ্ডু চিবিয়েছে, কলেজের হস্টেল থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো একবার, বিয়ের পরেও ও-রোগ সারেনি বলেই গোলমাল। তাছাড়া আমি ততদিনে কিছুটা অভিজ্ঞ স্বামী হয়েছি, আমার মনে হ'লো এই একা বাড়িতে একজন যুবতী মেয়েকে রাত কাটাতে দিলে তোমার সেটা ভালো লাগবে না। সবিনয়ে কিন্তু অল্প কথায় নীলিমাকে বিদায় দিয়েছিলুম সে-রাত্রে। তোমাকে লিখেওছিলুম খবরটা—উত্তরে তুমি পর-পর তিনখানা চিঠি লিখিছিলে আমাকে, নীলিমা যদি আবার আসে ওর সঙ্গে বেশি মেশামেশি যেন না করি, আর কিছুতেই যেন ওকে থাকতে না দিই বাড়িতে (আণ্ডারলাইন ক'রে দিয়েছিলে), 'আমার নিজের জন্য বলছি না, কিন্তু পাড়ার লোকেরা ভুল বুঝতে পারে, আমার বাপের বাড়িতে একটা কথা উঠলে বিশ্রী হবে, তোমাকে কেউ এতটুকু খারাপ ভাবলে আমার তা সহ্য হবে না বোঝো তো।'—আমার হিতৈষী তুমি, মালতী, হিংসুক নও, সন্দিহান নও—এও আমাকে মেনে নিতে হবে যেহেতু আমি পুরুষ আর তুমি স্ত্রীলোক। কিন্তু আমি জানি ঘটনাটা যদি উল্টো হ'তো, যদি আমি থাকতুম এলাহাবাদে আর আমার কোনো আত্মীয় বা বন্ধু নিরুপায় হ'য়ে একটা রাত কাটাতে চাইতো আমাদের ফ্ল্যাটে, তাহ'লে আমি এটাই আশা করতুম যে তুমি তাকে সিঁড়ি দিখিয়ে দেবে না, আর তাতে তোমার 'নিন্দে' হতে পারে এই ভাবনাটা খেলতেই না আমার মাথায়। পরে আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে আমি সেদিন অন্যায় করেছিলাম, সত্যি হয়তো বিপন্ন ছিলো নীলিমা, আমি বেশি কথাও বলিনি তার সঙ্গে, এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতেও বলিনি—আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলো তোমার ছায়া, মালতী, সেটাকে আমি ভয় পেয়েছিলাম। ও-রকম ব্যবহারের সঙ্গে আমার নিজের স্বভাবের মিল ছিলো না; যেহেতু আমি তোমার স্বামী, শুধু সেইজন্যেই ও-রকম করতে হয়েছিলো আমাকে।

মালতী, এটা তো মানবে তোমার উপর আমার ছিলো অন্ধ বিশ্বাস, তাতে কোনো শর্ত ছিলো না সীমা ছিলো না, কিন্তু তুমি ছিলে নিজের অজান্তেই আমার বিষয়ে সতর্ক—যদি কোনোদিন কোনো মহিলার শাড়ির বা রান্নার বেশি প্রশংসা করেছি, তাহ'লেও তুমি বলেছো—'ও-রকম বাড়াবাড়ি কোরো না তো, লোকেরা ভাববে তুমি কোনোদিন কিছু দ্যাখোনি, খাওনি।' 'লোকেরা ভাববে—' ঐ এক বোকার মতো কথা তোমার মুখে, লোকেরা ভাববে! যেন লোকেরা কী ভাববে বা ভাববে না তা নিয়ে কোনো বুদ্ধিমান লোক কানাকড়িও পরোয়া করে কখনো! তাছাড়া পাছে আমাকে কেউ কিছু খারাপ ভাবে সে বিষয়ে এতই যদি তুমি হুঁশিয়ার, তাহ'লে আজ কেন অপর্ণা ঘোসের বিষয়ে তুমি এত সহনশীল? শুধু সহনশীল নয়, এমনকি একটু উৎসাহী। হয়তো ভাবছো আমি কোনোমতে যদি অপর্ণার সঙ্গে জড়িয়ে যাই, তাহ'লে আমার আমার হাত থেকে পুরোপুরি নিস্তার পাও তুমি, আমার বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র তোমার হাতে আসে, নিজের একটা নৈতিক

সমর্থনও খুঁজে পাও। কিন্তু না, মালতী, তোমার এই আশা আমি মেটাবো না—তুমি তা চাও ব'লেই আমি সে রকম কিছু ঘটতে দেবো না, আমার আমি জমিয়ে-রাখা রাগ আর কষ্টের ছায়া ফেলে-ফেলে তোমার জীবন আমি কালো ক'রে দেবো।

কিংবা হয়তো ভুল ভাবছি, হয়তো ভালোবাসা ছাড়াও ঈর্ষা সম্ভব—অন্তত মেয়েদের মধ্যে। ধরো যদি একদিন ঘরে ঢুকে দ্যাখো, আমি অপর্ণার একটি হাত নিয়ে খেলা করছি, তাহ'লে তুমি কি টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলবে না আমাকে? যে-টাকাটা তুমি হেলাফেলা ক'রে রাস্তায় ফেলে দিলে সেটাই অন্য কেউ কুড়িয়ে নিলে তোমার সইবে না, হয়তো এমনি ক'রেই ভগবান তোমাকে তৈরি করেছেন। কিন্তু আমি একদিন ও-রকম অবস্থায় জয়ন্তকে দেখে ফেলেছিলাম তোমার সঙ্গে, তখন তুমি ভাবোনি প্রতিবেশীরা কী বলবে বা বলবে না, তোমার বাপের বাড়িতে কী-কথা উঠবে বা উঠবে না, ও-সব ভাবনা তুমিও ভুলে গেছো সম্প্রতি। তুমি ঠাণ্ডা গলায় বলেছিরে, আমি ভুল দেখেছি। আর তোমার কথাই সত্য ব'লে আমাকে মেনে নিতে হ'লো যেহেতু তুমি স্ত্রীলোক, আর যেহেতু আমি বেশি কিছু বললে 'জেলাস হাস্‌বেন্ড' নামক ঘৃণ্য আর হাস্যকর জীবে পরিণত হ'য়ে যাবো।

—বিয়ে! কী জটিল, কঠিন, প্রয়োজনীয়, সাংঘাতিক মজবুত একটা ব্যাপার, আর কী ঠুনকো! দু-জন মানুষ সারা জীবন একসঙ্গে থাকবে—পাঁচ, দশ, পনোরো বছর নয়, সারা জীবন—এর চেয়ে ভয়ংকর জুলুম, এর চেয়ে অমানুষিক আদর্শ, আর কী হ'তে পারে? সন্তানের সঙ্গে সারা জীবন একত্র থাকিয় না আমরা, বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন বন্ধু বেছে নিই, কিন্তু আশা করা হয় দাবি করা হয় যে একবার যারা স্বামী-স্ত্রী হ'লো তারা চিরকাল তা-ই থাকবে। এই অস্বাভাবিক অবস্থাটা সহ্য করা যায় এটাকে ঈশ্বরের বিধান ব'লে মেনে নিলে, আমাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখলে। কিংবা যদি বিয়েটাকে শুধু একটা নিয়মমাফিক পোশাকি গোয়াল ব'লে ধ'রে নিয়ে, দূরে-কাছে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা থাকে দুজনেরই। কিন্তু যদি কেউ বিয়ে ক'রে সুখী হতে চায়—যেমন আমি চেয়েছিলাম; যদি কেউ ভাবে একটিমাত্র স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে প্রণয়সম্বন্ধ আজীবন বজায় রাখবে—যেমন আমি ভেবেছিলাম; যদি কেউ বিয়ের মধ্যে মিশিয়ে দেয় 'হৃদয়' নামক ভীষণ কল্পনা, মারাত্মক বিষ—যেমন আমি দিয়েছিলাম; তা' হলে, কোনো-না-কোনো সময়ে, হয় বাইরের কোনো ঘটনার, নয়তো নিজের কোনো পরিবর্তনের ফলে, আর নয়তো নেহাতই সময়ের শত্রুতায় তাকে হ'তেই হবে ব্যর্থ, হতাশ, উচ্ছিন্ন, যেমন আজকে আমি এই রাত্রে এই বিছানায়, নিসঙ্গতায়, অন্ধকারে।

স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে আগে অনেক কথা হ'তো তোমার সঙ্গে আমরা। তুমি সব সময় বলেছো—মেয়েরা উৎপীড়িত, নির্যাতিত, স্বামী বিমুখ হ'লে এখনো তাদের দাঁড়াবার জায়গা নেই আমাদের সমাজে, তাদের তিলতম স্খলনেরও ক্ষমা নেই, কিন্তু পুরুষ স্বেচ্ছাচারী হ'লে কেউ দোষ ধরে না। কে না জানে মেয়েদের অবস্থা আমাদের দেশে সাধারণভাবে কত শোচনীয়, এখনো কত অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে তাদের উপর, কিন্তু তুমি কখনো ভেবে দ্যাখোনি যে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য যাঁরা যুদ্ধ করেছেন তাঁরা সকলেই পুরুষ, আর আজকের তুমি আমি আর আমাদের মতো অসংখ্য স্বামী-স্ত্রী যে ধরনের জীবন কাটাচ্ছে, সেটা সম্ভব হয়েছে পুরুষেরই উদ্যোগে, পুরুষেরই চেষ্টায়। অন্য একটা কথা তুমি মানোনি কখনো, আমি বোঝাতে পারিনি তোমাকে—যে সমাজ যেহেতু পুরুষের দ্বারা শাসিত, তাই পুরুষের কাছেই দাবি করা হয় বিশেষ এক ধরনের উদারতা ও সৌজন্য—আশা করা হয় সে স্ত্রীর সব কথা বিশ্বাস করবে, কোনো ছলনা টের পেলেও চেপে যাবে সেটা—মেয়েদের দুর্বলতার ক্ষতিপূরণস্বরূপ তারা পেয়েছে এক অসাধারণ সম্মান, সব সময়ই এই ভান আমরা চালিয়ে যাবো যে আমাদের স্ত্রীরা সমালোচনার অতীত। ভেবে দ্যাখো, নাটকে উপন্যাসে এটাই হয় যে স্বামী একনিষ্ঠ না-থাকলে স্ত্রীরা হন লেখকের ও পাঠকের করুণার

পাত্রী, বা এমনকি ট্রাজিক নায়িকা—কিন্তু উল্টোটা যখন ঘটে, যখন যথেষ্ট কারণ নিয়েই স্ত্রীর প্রতি সন্দিহান হয় স্বামী, ঈর্ষাতুর হয়, তখন—প্রায় সব সময়ই তাকে দেখানো হয় ঈষৎ হাস্যকরভাবে—সেই চিরাচরিত 'জেলাস হাস্‌বেণ্ড,' যে-ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার চাইতে লজ্জার ব্যাপার পুরুষের পক্ষে আর-কিছু নেই। সেইজন্যই নীরব থাকতে হয় আমাদের—থাকতে হয়েছে আমাকে—নিজের সম্মান, স্ত্রীর সম্মান বজায় রাখার জন্য।

বলতে পারো, মালতী, কবে আমরা প্রথম বুঝেছিলাম আমাদের বিয়ে ভেঙে গেছে? মনে পড়ছে না? শোনো, আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। সেই যে জয়ন্ত একদিন মদ খেয়ে এসে তোমাকে আবোলতাবোল কী বললে, আমি তাকে হাতে ধ'রে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে এলাম, ফিরে এসে তোমাকে বললাম আমি ওঁকে বলেছি আমাদের এখানে যেন আর না আসেন—সেদিন নয়, না, সেদিনও নয়, কিন্তু তারই কয়েকদিন পরে। ও-কথা আমি বলেছিলাম ঠিকই, কিন্তু যথেষ্ট জোরের গলায় বলিনি, মিনমিনে গলায় বলেছিলাম, 'আপনি আমাদের এখানে আর না-এলেই বোধ হয় ভাল হয়—' এই রকম ছিলো আমার ভাষাটা, নরম শোনাবার জন্য একটা 'বোধহয়' জুড়ে দিয়েছিলাম মনে আছে—যদিও ব্যাপারটা আমার কুৎসিত লেগেছিলো, ফ্ল্যাটের দরজায় মাতাল জয়ন্তকে দেখে রাগে আমার গা কাঁপছিলো, তুব সেই রাগটা প্রকাশ করতে পারিনি—এমনি আমার স্বভাব, আমার দুর্বলতা। তবু আমি মনে প্রাণে চেয়েছিলাম জয়ন্ত যেন সত্যি আর না আসে, কয়েকদিন পর্যন্ত এও আশা করেছিলাম হয়তো আমাদের পুরোনো জীবন ফিরে পাবো। কিন্তু দিনের পর দিন কাটে, আমি দেখতে পাই তুমি যেন ম'রে গিয়েছো, তোমার মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না, তোমার চলাফেরা পুতুলের মতো। ক্রমে আমার সন্দেহ হয় যে—এটা হয়তো ভালো হ'লো না, একজন অর্ধমৃত স্ত্রীলোক নিয়ে সত্যি তো কোনো লাভ নেই আমার। আমি বেশি কথা বলি না তোমার সঙ্গে, কেননা কিছু বলতে গেলেই কেমন একটা ঝাঁঝালো ব্যঙ্গের সুর ফুটে বেরোয় যেটাকে আমি চাপতে পারি না, অথচ চাই না যে কোনো মুখোমুখি বচসা হোক, বরং ভাবি যে এই মন-খারাপ নিয়ে নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি থাকাটাই হবে তোমার পক্ষে চিকিৎসা। (বোকার মতো, দাম্ভিকের মতো এই 'চিকিৎসা' কথাটাই ভেবেছিলাম তখন, যেন তোমার কোনো অসুখ করেছে, আর ওষুধের প্রেস্কৃপশন আমি খুঁজে পেয়েছি!) কিন্তু, যত দিন কেটেছে, যতবার তোমার মুখের দিকে তোমার অজান্তে আমি তাকিয়েছি, তত আমার মনে হয়েছে এটা ভোরের আগেকার অন্ধকার নয়, বরং এক ঠাণ্ডা ধূসরতা, শীতের দিনে বৃষ্টি হলে যেমন হয় তেমনি, এই আকাশ চুঁইয়ে কখনো যদি রোদ্দুরের ফোঁটা ঝ'রে পড়ে তাও হবে রোগা, ফ্যাকাসে, উত্তাপহীন। তুমি জানো না কেমন তোমাকে দেখাতো সেই সময়ে—কী-রকম বিবর্ণ শীর্ণ, নিষ্প্রাণ—বিষণ্ন নয়, বিষাদও সৌন্দর্য দেয়। কিন্তু তখন তোমাকে দেখে কেউ বলতো না তুমি দেখতে ভালো, তোমার মুখের গড়নও যেন বদলে গিয়েছিলো। আর তা-ই দেখে-দেখে অন্য একটা শিউরানি উঠলো আমার মনে; আমি অনুভব করলাম তুমি কত কষ্ট পাচ্ছো, আমার মনে হ'লো জয়ন্তও এই রকমই কষ্ট পাচ্ছে—তারপর ভাবলাম তিনজন মানুষ দুঃখী হবার চাইতে শুধু একজন দুঃখী হওয়া কি ভালো নয়? তোমার ঐ আর্ত মুখ ছোরা বিঁধিয়ে দিচ্ছে আমার বুকে—সমবেদনার অর্থে নয়, অন্য কারো অভাবে তোমার যে এই দশা হয়েছে সেটা আমারও পক্ষে মৃত্যুর মতো; কিন্তু এই অবস্থার কোনো প্রতিকার যদি না-ই থাকে তাহ'লে অন্তত তোমার মুখে হাসি ফুটুক, প্রাণ ফিরে আসুক এই যেখানে আমি আপিশ থেকে ফিরি, রাত্রে ঘুমোই। আমি লুব্ধ হলাম জয়ন্তকে এ-বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে; মনে-মনে বললাম—এ অবস্থা অসহ্য, এর পরে ভালো-মন্দ যা-ই হোক, অন্তত এই অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে আসতে চাই।

হঠাৎ শীত ভেঙে গিয়ে বসন্তের হাওয়া দিলো, মেঘ কেটে গিয়ে মাধুরী ফুটলো আকাশে—সেই যেদিন মালতী আর আমি একসঙ্গে 'চণ্ডালিকা' দেখেছিলাম। পবিত্র সেই অশ্রু, যা

দু-চার ফোঁটা ঝ'রে পড়েছিলো আমার গাল বেয়ে, চণ্ডালিকার বেদনার গান শুনতে শুনতে; পবিত্র সেই অমানিতার বেদনা, যা আমার মনকে ধুয়ে-মুছে নির্মল করে দিয়েছিলো, যেন নতুন উৎসাহে ও যৌবনে ভ'রে তুলেছিলো আমাকে। উৎসাহ, যৌবন: তার উৎস তো প্রেম; আমি মুহূর্তের জন্যে বুঝেছিলাম যে বৃদ্ধ হ'লেই যৌবন হারাতে হয় না, যদি হৃদয়ে থাকে প্রেম, যেমন ছিলো রবীন্দ্রনাথের, যাঁর রচিত শব্দগুলি, বিন্দুর পর বিন্দু, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, ঝ'রে পড়ছে আমার উপর, ব'য়ে যাচ্ছে আমার উপর দিয়ে, সুরের মধ্যে গ'লে গিয়ে, নাচিয়েদের চোখে মুখে প্রতিধ্বনি তুলে—সুস্বাদ, ঘুম-ভাঙানো, মনোহরণ আমার ভালোবাসার শক্তিকে পুনর্জীবিত ক'রে—যেমন ঐ কবিতাকে ভালোবেসেই আমি জগৎকে ভালোবাসতে পারছি। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পরে, ঘুম-ভাঙা মুহূর্তে, অন্ধকারে, যখন আমার এই সদ্য-ফিরে-পাওয়া ভালোবাসা মূর্ত হ'লো মালতীর জন্য আকাঙ্ক্ষায়, যখন আমি শরীরে মনে উদ্বেল হ'য়ে নিজেকে মেলাতে চাইলাম তার সঙ্গে, আর তুমি, মালতী, হঠাৎ শক্ত হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে মিলিয়ে গেলে আমার আকাশ-ছোঁয়া হাতের বাইরে, নিজেকে নামিয়ে আনলে তোমার নারীত্বের উচ্চ চূড়া থেকে একতাল মাংসের কর্দমে—আমার তখনকার সেই ব্যর্থতা, লজ্জা, অপমান—সে কথা কি কখনো কাউকে বলবার? আমার শরীরের এঞ্জিনে তখন ড্রাইভার ছিলো না—একটুখানি চ'লেই খানায় প'ড়ে গেলো, থেমে গেলো। আমি তখন জানলাম—যে ভাবে আমরা অভিধান খুলে কোনো নতুন শব্দের অর্থ জেনে নিই, ঠিক তেমনি নিশ্চিতভাবে জানলাম—যে তুমি জয়ন্তকে ভাবছো, ভাবছিলে, জয়ন্ত ছাড়া আর-কিছুতেই কিছু এসে যায় না তোমার। তবু আমি আরো একটুক্ষণ শুয়ে থাকলাম তোমার পাশে, উঠে আসার মতো শক্তি ফিরে পাবার জন্য, আর তখন তোমায় চুলের গন্ধে মাখা বালিশটা আমার প্রিয় মনে হ'লো, তোমার প্রতি এমন কোনো ঘৃণা অনুভব করলাম না যাতে জেদ ক'রে নিজের মনে বলতে পারি 'জন্মের মতো এই শেষ!' মনে হ'লো হয়তো এর পরেও আবার ফিরে আসবো তোমার কাছে—আর সবচেয়ে মর্মান্তিক লজ্জা সেইটাই।

পরের দিন আপিশ থেকে ফিরে জয়ন্তকে দেখে আমি বেশি অবাক হলাম না, প্রায় খুশি হলাম—আমি যেন প্রায় ধ'রেই নিয়েছিলাম যে তার পালা এখনো ফুরোয়নি।

সে-রাত্রেও খাওয়ার পরে আমি লিখতে বসলাম (আজকাল প্রায় নিয়ম ক'রে লিখি আমি, তর্জমা করি, নিজেও কিছু লেখার চেষ্টা করি মাঝে-মাঝে—ছাপা হোক আর নাই হোক—কিছু-একটা করার জন্যেই, যাতে ক্লান্তির চাপে ঘুমিয়ে পড়তে পারি, সেইজন্যই), কিন্তু লেখার প্যাড খোলামাত্র সাদা কাগজের উপর তিনটে শব্দ, সাতটি অক্ষর দেখতে পেলাম—তারা তাকিয়ে রইলো আমার দিকে একশো চোখে, এক হাজার চোখে, আমার সামনে দেয়ালে নাচতে লাগলো অক্ষরগুলো, সীলিঙে চামচিকের মতো উড়ে বেড়াতে লাগলো। 'জয়ন্ত, ফিরে এসো।' আমার নিশ্বাস খুব দ্রুত পড়ছিলো, আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিয়ে পাতাটি ছিঁড়ে ভাঁজ ক'রে রেখে দিলাম আমার দেরাজে, খামে ভ'রে, নানা দরকারি কাগজপত্রের তলায়। অনেকগুলো চিন্তা এক ঝাঁক ভিমরুলের মতো হুল ফুটিয়ে দিলো আমার মগজে মালতী কি চিঠি লিখেছিলো জয়ন্তকে আর তা পেয়েই সে চলে এসেছিলো আজ? না—তাহ'লে এই কাগজটাকে এমন অসাবধানে ফেলে রাখতো না সে, আর এমন একটা জায়গায় যেখানে আমার চোখেপড়া নিশ্চিত। কাতর, করুণ, আশাহীন মালতী—এটা লেখার সময় নিজের উপরে কোনো শাসন ছিলো না, তার সাংসারিক বুদ্ধি, তার মেয়েলি চতুরতা একেবারে কাজ করেনি। ঐ তিনটি শব্দ, সাতটি মোটা হয়ে-যাওয়া অক্ষর যার উপর বোঝা যায় অনেকবার কলম বুলিয়েছিলো মালতী—কত কথা তারা ব'লে দিলো আমাকে, কত স্পষ্ট ক'রে, কেমন সংশয়াতীত প্রাঞ্জলতায়! 'জয়ন্ত, ফিরে এসো—' এ যেন এক বিষাক্ত কবিতা আমি যার গভীর থেকে আরো গভীরে তলিয়ে যাবো ধীরে-ধীরে, কোনো গ্যালিলিওর দূরবীনে দেখা নিষ্ঠুর চাঁদ, যার অবয়ব অধ্যয়ন ক'রে কাটিয়ে দেবো বাকি জীবন। তা

যা-ই হোক, মালতীর বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র এলো আমার হাতে, আমি তাকে শাসাতে পারবো এবার, ভয় দেখাতে পারবো, অন্ততপক্ষে নিজেকে বসাতে পারবো বিচারকের আসনে, অন্তত আমার ফুটো-হ'য়ে-যাওয়া অহমিকাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো তার সামনে। দারুণ, দারুণ লোভ হ'লো তখুনি মালতীকে ডেকে ঐ কাগজটা দেখাতে—শুধু তার মুখের চেহারাটা কেমন হয় তা দেখার জন্য—মনে সবটুকু অবশিষ্ট শক্তি জড়ো ক'রে পিষে দিলুম সেই প্রলোভন। আপিশে যাবার সময় কাগজটা নিয়ে বেরিয়ে যাই (বুক-পকেটে, অতি সন্তর্পণে, যেন কোনো তাবিজ, কোনো গুপ্তমন্ত্র), ফিরে এসে আবার রেখে দিই দেরাজে—আপিশে কোনো ফাঁক পেলে বা বাড়িতে বেশি রাত্রে, খুলে দেখি, তাকিয়ে থাকি মাঝে-মাঝে : এমন ক'রে অনেকগুলো দিন কেটে গেলো, যে-দিনগুলিতে জয়ন্ত আর মালতী ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে, আর আমি তা দেখেও দেখছি না, যেহেতু আমার শেখা হ'য়ে গেছে এক জাদুমন্ত্র, যা দিয়ে আমি নিমেষে ওদের ধ্বংস করতে পারি। কিন্তু ওটা নিয়ে আমি কী করবো সে-বিষয়ে মনস্থির করতে পারি না; কখনো ভাবি হঠাৎ একদিন মালতীর হাতে দিয়ে বলবো, 'এই নাও তোমার প্রেমপত্র তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি' (শস্তা ঔপন্যাসিকেরা যাকে 'ক্রূর হাসি' বলেন সেই রকম কিছু—একটা মুখে ফুটিয়ে); কখনো ভাবি ওর বাবাকে পাঠিয়ে দেবো, সঙ্গে একটা বিস্তারিত চিঠি লিখে (কিন্তু চিঠি লেখাটা এত শক্ত কাজ ব'লে মনে হয় যে প্রায় তক্ষুণি সেটা সরিয়ে দিই মন থেকে); আমার মনে হয় যে সব চেয়ে ভালো কোনো সুযোগের অপেক্ষায় থাকা—একদিন যখন বচসা হবে (মাঝে-মাঝে হচ্ছে আজকাল), দু-পক্ষের মেজাজ সপ্তমে চড়বে, তখন হঠাৎ ওটা বের ক'রো ছুঁড়ে দেবো ওর মুখের উপর—রঙের টেক্কার মতো, আলোজ্বলা শহরের উপর অতর্কিত বোমার মতো—হঠাৎ নিবে যাবে ওর মুখের আভা, গলার তেজ, ভেঙে পড়বে ওর কুযুক্তির দেয়াল—অবশেষে ওকে হারিয়ে দেবার তৃপ্তিটুকু অন্তত পাবো আমি। কিন্তু তারপর ভাবি : ধরো ও যদি লুটিয়ে পড়ে, যদি আমার পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চায়, যদি বলে, 'আমি আর-কিছু চাই না, তুমি যা ইচ্ছে হয় করো, শুধু আমাকে থাকতে দাও এই বাড়িতে, বুন্নির কাছে—' তাতেই বা কী লাভ হবে আমার, আমি যা চাই তা কি ওতে ফিরে পাবো? তাছাড়া ওর চোখে জল দেখে, ওর মিনতি শুনে, আমিও যদি গ'লে যাই যদি মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে কল্পনা করি যে আমরা আবার যদি ফিরে যেতে পারি অতীতে? না—প্রথমে আমি যাকে দিব্যাস্ত্র ভেবেছিলাম, আসলে তা খোলামকুচি, তা দিয়ে আমার চিন্তার স্রোতে আঁচড় কাটা যায় কিন্তু আর—কোনো কাজে তা লাগবে না। ওটাকে পকেটে নিয়ে ব'য়ে বেড়াতে-বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম একদিন।

কোথায় সেই কাগজটা এখন? সেই চরম সাক্ষী, মহার্ঘ দলিল, দুর্দান্ত প্রমাণ? কোথায় শেষ রেখেছিলাম তাও ঠিক্ মনে পড়ছে না। হয়তো অন্য কোনো দেরাজে সরিয়েছিলাম, অগুনতি বাজে কাগজপত্রের মধ্যে—সেখানে হয়তো ধুলোয় আরশোলায় দিনে দিনে ক্ষয় পাচ্ছে সেই জড় কাগজ, না কি মনের ভুলে আপিশে ফেলে এসেছি, না কি দৈবাৎ হারিয়ে গেছে? কিন্তু সেটাকে উদ্ধার করার আর কি কোনো প্রয়োজন আছে, যখন মালতী আর আমি হয়ে উঠেছি পরস্পরের চক্ষুশূল, হৃদয়ের শেল, যখন ঐ কাগজে সে যা লিখেছিলো তার হাজারগুণ বেশি বলছে তার প্রতিটি ব্যবহার, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি, আর আমি—দুর্বল আমি!—প্রতিশোধের অন্য কোন উপায় না-পেয়ে কথা দিয়ে তাকে আঘাত করছি যতদূর করা যায়?

জানো, মালতী, এখন আমার কী মনে হয়? তোমার কথা শুনে আমি কষ্ট পেয়েছিলাম সেজন্যে নয়, আমার কথা শুনে তুমি কষ্ট পেয়েছিলে সেজন্যেও নয়, সেগুলি হয়তো মুছে যেতো বা আমরাই পারতাম অতি সহজে মুছে দিতে—যদি—যদি অন্তত তোমার আমার শরীরের মধ্যে বন্ধুতা থাকতো! অন্তত কেন বলছি—শরীরটাই আসল, চরম, সর্বস্ব; ওটাই স্বামী-স্ত্রীর নির্ভর, বিয়ের নির্ভর—তারই জোরে এমন একটা অসম্ভব আশা করা হয় যে দু-জন-মানুষ বরাবর একসঙ্গে

থাকবে। অথচ সেটা আর নেই আমাদের মধ্যে, তাই আমরা পরস্পরের অচেনা হ'য়ে গিয়েছি, পরস্পরের ভাষাও আর বুঝি না। মুশকিল এই যে আমি তোমাকে এখনো—কী বলবো—ধরা যাক 'ভালোবাসি'—আর এই কথাটায় যদি তোমার আপত্তি থাকে তাহ'লে বলবো 'কামনা করি'—হ্যাঁ আমি চাই তোমাকে, ঠিক পুরোপুরি শারীরিক অর্থেই কামনা করি বলা যাক—কিন্তু তোমার শরীর আমাকে আর সাড়া দেয় না। যেখানে কারো কিছু করার নেই—না আমার, না তোমার, না চণ্ডালিকা, নাটকের না, নিবিড় অন্ধকার কোনো রাত্রির। আমি অন্ধকারেও বুঝেছি তোমার তাচ্ছিল্য—অবজ্ঞা—অনিচ্ছা; বুঝেছি তুমি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছো শুধু—আর তা বোঝামাত্র আমিও হিম হ'য়ে গিয়েছি—হিম, দুর্বল, রিক্ত, অক্ষম। কী প্রহসন! কী অপমান! তবু আমি চেষ্টা করেছি, বারবার চেষ্টা করেছি যদি কোন দৈবক্ষণে বন্ধ দরজা খুলে যায়—কিন্তু কিছুদিন পরেই দাঁড়িয়ে গেলো একটা দেয়াল, বোবা দেয়াল, ঠাণ্ডা দেয়াল, পাশাপাশি বিছানা দুটো জেলখানার দুটো কুঠুরি হ'য়ে উঠলো, পাশাপাশি দুই কয়েদিকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছে। তখনই বুঝলাম—না, বুঝেছিলাম আগেই—তখন থেকে মেনে নিয়ে ছিলাম আমাদের বিয়ের ভিত ফেটে গেছে, এ-বাড়ি আর বেশিদিন টিকবে না।

—কিন্তু কি বলছি আমি, কি ভাবছি? কেমন করে শরীরের সঙ্গে শরীরের বন্ধুতা থাকবে, মন যদি স'রে দাঁড়ায়? শরীর—যত জ্বালা এই শরীর নিয়ে, অথচ ওটাকে না হ'লেও চলে না, ভগবানের এই এক আশ্চর্য আর নিষ্ঠুর বিধান যে আমাদের মন, বা আত্মা, যাই হোক না, যে চায় আকাশ, অসীম, অমৃত ইত্যাদি অনেক-কিছু—সেই মন যখন ভালোবাসে তখন তার যন্ত্র হিসেবে ভাষা হিসেবে উপায় হিসেবে বেছে নেয় এই শরীরটাকেই, এই ছোট্ট নোংরা বুড়ো-হওয়া ঘেন্নায় ভরা শরীরটা! কোথায় তবে সেই 'প্রেম,' কবিরা যার কথা বলেন? আমরা বন্দী হ'য়ে আছি শরীরের মধ্যে; মনে-মনে ধ্যান ক'রে, চোখে-চোখে ইশারা ক'রে, বা এমনকি ঠোঁটে-ঠোঁটে চুমো খেয়ে তৃপ্ত হ'তে পারি না আমরা, আমাদের নেমে আসতে হয় এক ঘন অন্ধকারে, জন্তুর গুহায়, উৎকট ব্যায়ামে, একলা শরীরও শরীরকে পারে না সুখী করতে। অন্তত আমরা চোখে দেখতে চাই, কানে শুনতে চাই, কিন্তু চোখের জ্যোতি, গলার সুর, ঠোঁটের হাসি—তারও যোগানাদান হ'লো মন, আমরা মন দিয়ে সুন্দর দেখি, মন দিয়ে কামনা করি, তারপর বার্তা ছড়িয়ে পড়ে শরীরে। আমরা কোনো নারীকে যখন 'চাই', যখন 'ভোগ করি', আসলে তখন দখল ক'রে নিতে চাই তার সমগ্র সত্তাকে, খুঁজি সেই একজনের মধ্যে আমাদের সব স্বপ্ন-পড়া বইয়ের স্মৃতি, বাস-এ দেখা চোখ, কোনো প্রিয় কোনারক-ভঙ্গি, কোনো অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বর, কিংবা আমাদেরই অজান্তে, আমাদেরই কামনার তাপে, সেই সবগুলি লক্ষণ মিলে যায় সেই নারীর মধ্যে—মুহূর্তের জন্য—কী চপল কী ভঙ্গুর সেই মুহূর্ত!—আর তারপরেই বুঝতে পারি আমাদের মন যা চায় আমাদের শরীর তা কিছুতেই গ্রাস করতে পারে না, অথচ শরীর ছাড়া কোনো উপায় নেই আমাদের। কী সংকট! কী অদ্ভুত সমস্যা! কিন্তু তবু এইটুকুই আমার ভাগ্য যে মালতী তার শরীর দিয়ে মিথ্যে বলেনি—মন দিয়ে, কথা দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে, এমনকি হয়তো চোখ দিয়েও মিথ্যে বলেছে, কিন্তু তার শরীর সত্যবাদী—ভালোবাসার গর্ভ, আর আঁতুড়ঘর, আর সরাইখানা, আর শ্মশান, তার শরীর। মালতী, আমাকে নির্ভুল জবাব দিয়েছে তোমার শরীর, জয়ন্তকেও নির্ভুল জবাব দিয়েছে, আমি তোমাকে দোষ দিই না, তুমি সত্য আচরণ করেছো।

আবার বৃষ্টি, পাশে গ্যারেজের টিনের ছাদে ঝমঝম্, কত রাত্রে শুনেছি এই বৃষ্টির শব্দ তখনও এই দুই খাট আলাদা হ'য়ে যায়নি, তখন এ-পাড়ায় বর্ষাকালে মশা হ'তো, বুন্নি তখনও তিন মাসের, বুন্নির জন্যই মশারি খাটাতো মালতী—মশারির ভিতরে এসে বিছানাকে আমার মনে হ'তো দুর্গ—একটা গুহা—ছোটো আঁটো ঘনিষ্ঠ সহজ, একটা গন্ধ পেতাম শরীরের গন্ধ, মালতী, চুলের গন্ধ, বুকের গন্ধ, তোমার বুকের দুধের গন্ধ পেতাম সেই বিছানায়—প্রচুর দুধ ছিলো

তোমার, বুন্নির ঠোঁট বেয়ে উপচে পড়তো বিছানার চাদরে, ঘরে পাতা পুরোনো দইয়ের মতো সেই ঝাঁঝালো গন্ধটা আমার নেশার মতো লাগতো, আমি নিশ্বাসে তা শুষে নিয়েছি, আমি ঠোঁট দিয়ে ছুঁয়েছি তোমার বুকের সেই উষ্ণ প্রসবণ—সব কেমন ছোট আর ঘনিষ্ঠ আর সহজ ছিলো—সব ছিলে তুমি, মালতী, গুহা, দুর্গ, আশ্রয় আমার—সব কি আমার বোঝার ভুল, সব কি শুধু অসার কবিতা, পড়া-বইয়ের স্মৃতি, সব কি আমি মনে মনে বানিয়ে নিয়েছিলাম?

মালতী, তুমি কি শুনতে পেয়েছো আমার কথা—উঠে বসলে কেন? বিছানা থেকে নেমে এলে কেন জানালার ধারে? আবছা আমি দেখছি তোমাকে আবছা সাদা, তোমার শরীর যেন মাংসের স্থূলত্ব হারিয়ে হালকা, স্বপ্নের মতো, বাইরের দিকে মুখ ক'রে তুমি দাঁড়িয়ে, বোজা তোমার চোখ আমার মনে হচ্ছে, ধুয়ে দিচ্ছে বৃষ্টি আর বাতাসে তোমার মুখ, তোমার পিঠের ভঙ্গিতে অপেক্ষা আমি দেখতে পাচ্ছি। এতক্ষণে বাইরে বোধহয় ভোর কিন্তু মেঘের জন্য আলো ফোটেনি, এসো এই স্তব্ধ সুন্দর গভীর মুহূর্তে আমরা আবার—সব ভুলে যাও সব ভুল, এসো আবার এসো আবার—'মালতী'! আমি উঠে গিয়ে আস্তে হাত রাখলাম তার কাঁধে, আমার আঙুলের তলায় তার রক্তের তাপ, আমার নিশ্বাসে তার গন্ধ, তার পুরোনো গন্ধ। নিশ্বাসের সুরে আবার ডাকলাম, 'মালতী!' হঠাৎ থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো সে, ফিরে দাঁড়িয়ে আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকালো, আমি তার মুখ তুলে ধ'রে গালে চুমো, চোখের জলে লোনা তার গাল, চোখে গলায় বুকের খাঁজে চুমো, চোখের জল বৃষ্টির ছাঁটে মিশে গেল, বৃষ্টি আর বাতাস আমাদের ধুয়ে দিচ্ছে—হালকা, নরম স্নিগ্ধতায় ভরা, আমাদের বারো বছরের জীবন যেন ভোরের বাতাস, স্মৃতি ছড়িয়ে গন্ধ ছড়িয়ে ব'য়ে গেলো, বুকের শব্দে বুকের শব্দ নিশ্বাসে নিশ্বাস, আমরা স্বামী-স্ত্রী—আশ্চর্য—সন্তান বড়ো হ'য়ে দূরে, বন্ধু আর বন্ধু নেই—শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী শুধু, এসো আমরা একসঙ্গে বাঁচি, বেঁচে উঠি আবার, ঐ দ্যাখো জীবন আমাদের অপেক্ষায়—রাত ভ'রে অপেক্ষায়—এসো তাকে তুলে নিই আমরা, জড়িয়ে ধরি পরস্পরের মধ্যে—এসো—তোমার ঠোঁট দুটি ফুলের মতো খুলে গেলো এগিয়ে এলো, অন্ধকারে তোমার কান্নাভেজা নরম হাসি—না, কথা না, ক্ষমা চেয়ো না, মালতী, এসো—

আমি নিচু হ'য়ে তার খোলা ঠোঁটের উপর—কিন্তু আমার ঠোঁট কোনো সজলতার স্বাদ পেলো না, মালতী যেন বাতাসের মধ্যে বাতাস আর আমি বালিশটাকে কামড়ে চাদরের একটা কোণ মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে, আর আমার ঘুমের উপর স্বপ্নের উপর জেগে ওঠার উপর ছড়িয়ে আছে করুণাময় অন্ধকার, ঝ'রে পড়ছে করুণাময় বৃষ্টি। নামো, বৃষ্টি, আরো তুমুল হ'য়ে, আরো ঘন হও, অন্ধকার—লুকিয়ে রাখো তাদের যারা জেগে উঠতে ভয় পাচ্ছে আজ, লুকিয়ে রাখো এই লজ্জা যে তারা এখনো একই ঘরে শুয়ে আছে। ভোর, দূরে স'রে যাও—আলো আমাদের দয়া করো।

পাঁচ

ভোরের দিকে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো, উঠলো বেলায়। আর মেঘ নেই, ঝকঝকে রোদ্দুরের দিন।

চায়ের টেবিলে বসলো এসে দু'জনে। জানালা দিয়ে ট্যারচা রোদ টেবিলে, চায়ের পেয়ালাগুলো ঝকঝকে আর সাদা।

দুর্গামণি চা নিয়ে এলো। নয়নাংশু খবর-কাগজ খুললো।

—'আজ বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে। দুর্গামণি, শিগগির বাজারে যাও।'

—'দ্য গোল দেখছি মহা মস্তান হ'য়ে উঠেছে। আমার আজ আপিশ নেই। মহরমের ছুটি।'

('ওর আজ ছুটি। আমাকে কিছু করতে হবে আজ। কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে সারাদিন। আলমারি থেকে সব শাড়ি নামিয়ে আবার গোছাবো। দেয়ালে ঝুল। পাখায় ধুলো। রান্নাঘরে ঘষামাজা। বাথরুমে ঘষামাজা। ভেজা কাগজ ঘ'ষে ঘ'ষে জানালার কাঁচ ঝকঝকে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব করাবো কেষ্টকে দিয়ে। নিজের হাতে করবো সব। সবচেয়ে ভালো হাতের কাজ, গতর খাটা। কিছু ভাবার ফুরসত নেই। মনের বালাই ঝেঁটিয়ে দূর। খিদে। ক্লান্তি। ঘুম। বস্তির ঝিয়েরা কখনো কি ভালোবাসা নিয়ে মাথা ঘামায়? মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘর মোছা, বাসন ধোয়া, কাপড় কাচা, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত রোজ, তার তলায় চাপা প'ড়ে যায় শাশুড়ির লাথি, স্বামীর হুংকার, ছেলেপুলের সংখ্যা ও অপমৃত্যু। সুখের সময় নেই, শোকের সময় নেই: পরম চিকিৎসক খাটুনি।')

—'এই আনারসের জ্যামটা বেশ। চোখে দেখবে নাকি?'

—'না। আবার একটা ট্রেন-দুর্ঘটনা। কী যে হচ্ছে!'

—'কেমন শরৎকালের মতো হয়েছে আজ দিনটা।' মালতীর চোখ বাইরে থেকে ঘরে ফিরে এলো—বাতাবি-রঙের দেয়াল, আলমারিতে কাচের বাসন, কার যেন আঁকা সূর্যমুখী ফুলের ছবি। সব ঝকঝক করছে, সারা রাত বৃষ্টির পরে ঝকঝকে রোদ্দুরে।

—'তোমার আজ ছুটি?'

—'আমার আজ ছুটি।'

('আমার আজ ছুটি। মুশকিল। কী করি বাড়ি ব'সে সারাদিন? মালতী। আর আমি। এক বাড়িতে, একা বাড়িতে সারাদিন। কী করি? বিবাহবিচ্ছেদ? আদালত? ছ্যোঃ! নাটুকেপনা। বাজে হৈ-চৈ। কিন্তু মালতী যদি চায়? চাইবে কি? সে-ই বা তাতে এমন কী পাবে যা এখন পাচ্ছে না! মোহ—কেটে যাবে। জয়ন্ত—কেটে পড়বে একদিন। তারও আছে স্ত্রী ছেলেপুলে সংসার। আর মালতীর আছে বুন্নি বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি। আর—শেষ পর্যন্ত কে কী বলবে সেই ভাবনা। আর আমি—কিন্তু না! এ সহ্য করা যায় না। আমি অপমানিত হয়েছি। মাসের পর মাস, দিনের পর দিন—অসম্মান, অপমান, লাঞ্ছনা। আমি সহ্য করবো না। আমি প্রতিশোধ নেব। ডিভোর্স। বুন্নিকে দেবো না। এক পয়সা খেসারত দেবো না। বুন্নিকে শেখাবো—তোমার মা খারাপ, তোমার মা-কে তুমি ভুলে যাও। যাক যেখানে খুশি; চুলোয় যাক; গোল্লায় যাক। আবার বিয়ে করুক। আমি কিছু জানি না। আমি প্রতিশোধ নেবো।')

চা গিলতে গিয়ে বিষম ঠেকলো নয়নাংশুর। মালতী বললো, 'এক ঢোঁক জল খাও।' নয়নাংশু জলের গ্লাশে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের পাতা ওল্টালো।

—'কলকাতায় আরো পাঁচশো ট্যাক্সি ছাড়া হবে। ভালো।'

—'বুন্নিকে অনেকদিন ধ'রে কথা দিয়ে রেখেছি চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবো। হ'য়ে আর উঠছে না।'

('সেই ভালো। বেরিয়ে পড়ি চিড়িয়াখানায় বুন্নিকে নিয়ে। সঙ্গে অংশু, আর-জয়ন্ত। কী দোষ তাতে—বেশ তো, ভালো। অনিদ্রায়, অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দে—সব কেমন প্রকাণ্ড হ'য়ে উঠেছিলো কাল, আমি ভয় পেয়েছিলাম, হঠাৎ মনে হয়েছিলো অচেনা দেশে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আজ এই শরতের মত রোদ্দুরে সব কেমন সহজ মনে হচ্ছে—সহজ, আর স্বাভাবিক কী হয়েছে? কিছুই হয়নি। নয়নাংশুরই বন্ধু জয়ন্ত—আমারও বন্ধু। বুন্নিও ভালোবাসে জয়ন্তকে। জয়ন্ত কাছে থাকলে নিশ্চিত লাগে আমার—এই সংসারে ও আমার মস্ত সহায়। আর এই সংসার কার? নয়নাংশুর।')

—'চৌরঙ্গিতে দ্বারভাঙা বাড়িটা ভেঙে ফেলেছে। একটা স্কাইস্ক্রেপার উঠবে সেখানে।'

—'ভাবছিলাম আজ নিয়ে যাবো। দিনটা বেশি গরম হবে না আজ। বৃষ্টিও নেই।'

—'বেশ তো। কেষ্টকে পাঠিয়ে দাও বুন্নিকে নিয়ে আসুক।'

—'পাঠিয়ে দিয়েছি। বুন্নি এসে পড়বে এক্ষুণি। তুমি তো জীবজন্তু দেখতে ভালোবাসো। তুমি কি যাবে?

—'আমি? না। আমি যাবো না।'

('নির্লজ্জ! "তুমি কি যাবে?" চোখে মিথ্যা, মুখে মিথ্যা, প্রতিটি পা ফেলায় মিথ্যা। কিন্তু আমি ক্ষমা করবো না। আমি ক্ষমা করবো না। আমি যন্ত্রণা দেবো ওকে, ছোট-ছোট যন্ত্রণা, সূক্ষ্ম নির্যাতন—দিনের পর দিন বছরের পর বছর, সারা জীবন! আমি ভুলবো না, আমি ছাড়বো না ওকে, আমি ক্ষমা করবো না। কষ্ট দেবো—সারা জীবন। বুন্নি বড়ো হ'তে হ'তে ওর মা-র কাছে শুনবে ওর বাবা এক নিষ্ঠুর খামখেয়ালি অত্যাচারী মানুষ। বুন্নি আমাকে ভালোবাসবে না। সকলেই ওর পক্ষ নেবে, যেহেতু ও স্ত্রীলোক। আর যেহেতু ও স্ত্রীলোক, আমি কিছু বলতে পারবো না কখনো, সারা জীবন মুখ বুজে থাকতে হবে, বজায় রাখতে হবে আমার স্ত্রীর সম্মান। আর স্ত্রীলোককে অবলা বলি আমরা! কী মারাত্মক অবলার বল, আর পুরুষ—যদি ভদ্রলোক হয়—সে কি সাংঘাতিক অসহায়!')

—'একটা সাদা ভালুক এসেছে চিড়িয়াখানায়। বরফের ঘরে রেখেছে। যাবে নাকি।'

—'আমার অন্য কাজ আছে। বরং জয়ন্তকে খবর পাঠিয়ে দাও। সে বেশ বুন্নিকে কাঁধে তুলে দেখাতে পারবে সব।'

'জয়ন্তবাবুর কি সময় হবে এক্ষুণি?'

'তুমি বললেই হবে। কেষ্টকে পাটিয়ে দাও।'

চোখাচোখি হ'লো, তাদের, সকালে ওঠার পরে এই প্রথম। দুটো দৃষ্টি ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো।

('এটা কেন বলতে গেলাম? কী বোকামি! না, এই আমার প্রতিশোধ। তুমি যা চাও তা-ই দিচ্ছি তোমাকে। তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। অথচ ছাড়ছি না। আমি তোমাকে যন্ত্রণা দেবো, ছোটো ছোটো সূক্ষ্ম যন্ত্রণা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর—তাই আমি তোমাকে চাই। তাই তোমাকে দরকার আমার!-শুধু তা-ই? একটা স্মৃতি কি নেই? কিন্তু সেই স্মৃতিও আমি মুছে ফেলবো মন থেকে, উপড়ে ফেলবো, থেতলে দেবো পায়ের তলায়। কিন্তু যদি আমি মনস্থির করি ওকেই ভালোবাসবো? সব নিয়েও, সব সত্ত্বেও, ওকেই? বিনা আশায়, বিনা প্রতিদানে, কষ্ট ভুলে গিয়ে? তা কি সম্ভব নয়? মনস্থির করলে সবই পারা যায়। ভালোবাসতে পারাটাই সুখের—যদি শুধু ভালোবাসাকেই ভালোবাসি, ধরাছোঁয়ার মতো আর-কিছু যদি নাও থাকে, তবু।—কিন্তু না, আমি উল্টোরকম মনস্থির করবো। উপড়ে দেবো শিকড়সুদ্ধু গাছ, যাতে একদিন ফুল আর ফল ধরেছিলো। প্রতিটি পাতা ছিঁড়বো নিজের হাতে। পায়ের তলায় মাড়িয়ে মাড়িয়ে থেঁতলে দেবো ফুল, ফল, পাতা, শিকড়। সেই জমিতে ফুটে উঠবে আমার কষ্ট, আমার ঘৃণা, এক আশ্চর্য বিশাল বিদেশী কোনো ফুলের মতো। ক্যাক্টাসের মতো সুন্দর ও কাঁটায় ভরা, ক্যাক্টাসের ফুলের মতো, মহার্ঘ, সাপের ফণার মতো বিষাক্ত ও সুন্দর। এই আমার প্রতিশোধ।')

নয়নাংশু বসার ঘরে এলো; সোফায় ব'সে 'আর্ট অ্যান্ড পাব্লিসিটি' নামে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাতে লাগলো। কী চমৎকার বুক-কভার করে আজকাল আমেরিকায়। সিগারেটগুলি একদম নেতিয়ে থাকে বর্ষাকালে, ধোঁয়া বেরোয় না। আমার ফাউন্টেনপেনটা সারাতে দিতে হবে। আমি দাড়ি কামাইনি এখনো। কামানো? থাক, ছুটির দিন। না-কামালে কুটকুট করে। করুক। কামাবো না? না, হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, না। আজ সারাদিন ধ'রে একটা বই পড়লে হয়। উপন্যাস? নাটক? কোনো জীবনী? জীবনী ভালো হবে—না, নাটক—না, উপন্যাস। কোথাও ঘুরে আসবো

চটি পায়ে আধময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি প'রে? না—আজ বড্ড রোদ, আলো। আমার ভালো লাগে মেঘলা দিন, ছায়া, বৃষ্টি, আবছায়া, আমার ভালো লাগে শহর বৃষ্টি দোতলা বাস নিয়ন-বাতি, ঝাপসা শহর মানুষ ঝাপসা দিন।

চোখ মেলে দেখলো সামনে মালতী দাঁড়িয়ে। স্নান ক'রে এসেছে এইমাত্র, পিঠের উপর চুল খোলা, হাতে চিরুনি। নয়নাংশুর হঠাৎ সময়টা গোলমাল হ'য়ে গেলো—মনে হ'লো একটা অন্য কোনো দিন, অনেক আগেকার অন্য কোনো দিন। চোখ তুলে তাকালো মালতীর দিকে।

—'তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ব'সে ব'সে।'

—'তা-ই নাকি?'

—'আমি ভাবছি বরং বেলেঘাটায় যাই।'

—'হঠাৎ বেলেঘাটায়?'

—'পিসিমাকে একবার দেখে আসি।'

পিসিমার কথা শোনামাত্র নয়নাংশুর সব মনে পড়ে গেলো। চোখ সরিয়ে নিলো।

—'চিড়িয়াখানার কী হ'লো?

—'আর-একদিন হবে।'

—'বুন্নি এলে তাকে নিয়ে যেয়ো।'

—'হ্যাঁ, বুন্নিকে তো নেবোই। তুমি?'

—'আমি?'

—'তুমি কি যাবে?'

—'চিড়িয়াখানায়?'

—'না, বেলেঘাটায়। তুমি কি যাবে?'

-'আমি তো কাল গিয়েছিলুম।'

—'আজও যেতে পারো।'

—'না, আজ আমি যাবো না।'

('যাবে না? আলবত যাবে। আমি মিষ্টি ক'রে বলবো দু-চারবার, চোখে মিনতি ফুটিয়ে বলবো, "চলো না!" একবার হয়তো হাত দেবো ওর চুলে—আর তখন ও গুটিগুটি পায়ে উঠে দাঁড়াবে। পুরুষ! দশটা পুরুষকে একসঙ্গে খেলাতে পারে একটা মেয়ে, মাথায় যদি ছিটেফোঁটা বুদ্ধি থাকে। অমন বোকা একটা দু পেয়ে জন্তু ভগবান আর তৈরি করেননি। ছিঃ! কী ভাবছি! অংশু তো কোনো ক্ষতি করেনি আমার। ও ভালো, কিন্তু ওর ভালোত্ব তেমন কাজে লাগলো না—এই হয়েছে মুশকিল। কাজে লাগলো না—তারই বা অর্থ কী? আমি কি ওকে ছেড়ে গিয়েছি, না কি যেতে পারি, না কি ও-ই আমাকে কখনো বলবে 'চ'লে যাও'? না-কেউ যেন কল্পনাও না করে আমি এই সংসার ভেঙে দেবো। তা কী ক'রে হয়—আমি তো বুন্নির মা। আমার জামাই হবে একদিন, কুটম্ব হবে, নাতি-নাতনি হবে। এই সংসার আমার—তিলে তিলে আমি একে গড়েছি, সাজিয়েছি, বাড়িয়েছি। আমি অংশুরই স্ত্রী-থাকবো চিরকাল—সব জেনে, সব বুঝেও অংশুকে থাকতে হবে আমার স্বামী সেজে। এই ওর শাস্তি, এই আমার শাস্তি। আর শাস্তিও এতেই।')

—'শোনো, আমি আজ সারাদিন বেলেঘাটায় কাটিয়ে আসবো—অনেকদিন যাওয়া হয়নি ও-বাড়িতে।'

নয়নাংশু হাঁটুর উপর হাঁটু তুলে দিলো, চোখ নামালো 'আর্ট অ্যান্ড পাব্লিসিটি'র পাতার উপর। মালতী শোবার ঘরে অদৃশ্য হ'লো।

('চিড়িয়াখানায় বেলেঘাটায়, চিংড়িহাটায় উল্টোডাঙ্গায়। আমি কি ঘুমিয়ে পড়ছি আবার? না, ঘুমোলে চলবে না, আমাকে ভাবতে হবে। পাছে সন্ধেবেলা জয়ন্ত এসে ফিরে যায়, তাই এখনই

পিসিমাকে দেখতে যাচ্ছে। কর্তব্য ত্রুটি হ'তে দেবে না। বা হয়তো জয়ন্তকে এড়াতে চায় আজ। বা হয়তো সবই আমার ভুল। বা হয়তো ভুল নয়। বা হয়তো বাড়িয়ে দেখছি পুরো ব্যাপারটাকে। বা হয়তো যা ভাবছি তা নয়। হয়তো যা ভাবছি তা-ই। সে যা হয় হোক, আমার আর এসে যায় না কিছু। ওর কথায় আমি রাজী হ'লেও কিছু এসে যায় না। জয়ন্ত, মালতী, আমি—একসঙ্গে বুন্নিকে নিয়ে চিড়িয়াখানায়, বেশ তো। আমার যাওয়া, আমার না-যাওয়া—একই ব্যাপার। কোনো তফাত নেই। দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'রে ফিটফাট হ'য়ে যাই যদি "সপরিবারে" বেলেঘাটায় সারাদিন কাটিয়ে আসি? গেলে হয়, না-গেলেও হয়—কোনো তফাত হবে না। এটা ফরাশি বিপ্লব নয়, রুশ বিপ্লব নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নয়—পঞ্চাশ বছর পরে এর কী চিহ্ন থাকবে? দশ বছর পরে এর কী চিহ্ন থাকবে? পাঁচ বছর পরে এর কী চিহ্ন থাকবে? জীবন-স্টিম-রোলার, ভীষণ, ক্ষমাহীন, দয়াময়। এমনি চলবে। একদিন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠবে ওরা—মালতী আর জয়ন্ত। আর নয়নাংশু। কষ্ট ম'রে যাবে, ইচ্ছে ম'রে যাবে, শরীর ধ্ব'সে যাবে, গনগনে রাগের উনুনে প'ড়ে থাকবে শুধু একমুঠো ছাই। এই তো; এখনই রাগ নেই আমার—দিনের আলো, খবর-কাগজ, ট্রামের শব্দ; সব মিলিয়ে কেমন সাধারণ, কেমন সাধারণ।! রোজ এই দিনের আলো ট্রামের শব্দ খবর-কাগজ—রোজ—রোজ—রোজ—তারপর একদিন ধুমধাম ক'রে বুন্নির বিয়ে দেবে তোমরা, তুমি আর মালতী—ধীরে-ধীরে বুড়ো হবে—যেমন চারদিকে কোটি-কোটি মানুষ—অন্ধ, মূর্খ, অচেতন—তেমনি বেঁচে থাকবে বছরের পর বছর। কিন্তু একটা কথা ঠিক জেনো; ছেঁড়া তার আর জোড়া লাগবে না, হারানো সুর ফিরে পাবে না কখনো—যে তোমাকে ভালবাসে না তার সঙ্গে, যাকে তুমি ভালবাসতে ভুলে যাবে তার সঙ্গে—ভালবাসা জরুরী নয়, স্বামী-স্ত্রী জরুরী, বেঁচে থাকাটা জরুরী। একটা হাত কাটা গেলেও বেঁচে থাকে মানুষ, একটা ফুসফুস নষ্ট হ'লেও বেঁচে—থাকে—সে-তুলনায় কত ছোট এই ক্ষতি, কত তুচ্ছ এই ঘটনা। ধূসর-কালো নয় উজ্জ্বলও নয়, হিংস্র সুন্দর মহৎ নিষ্ঠুর ভোগী ত্যাগী—কোনোটাই নয়—কোটি-কোটি মানুষ—জীবন—অফুরন্ত, মূর্খ, অন্তহীন। তুমি এমন কী মহাপুরুষ যে অন্যরকম পাবে? ওঠো, নয়নাংশু, তাকিয়ে দ্যাখো আজকের এই ঝকঝকে দিনটির দিকে তোমাদের এই নতুন জীবনকে অভ্যর্থনা জানাও।')